বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-জানুয়ারি। সাল-২০২৬

অমিত শাহের ভাষণ *(দ্বিতীয় কিস্তি)*

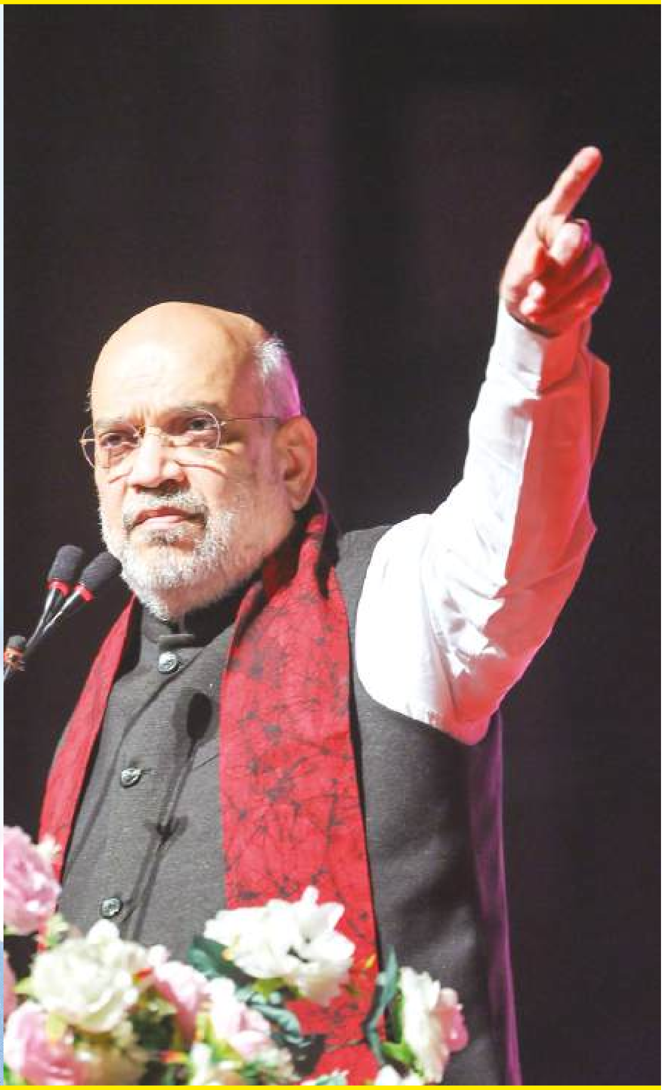

২০২৬-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন

নয়াদিল্লিতে বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস
ডায়ালগে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

আহমেদাবাদ আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী
এবং জার্মান চ্যান্সেলর সম্মানীয় ফ্রেডরিখ মার্জ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতে বিজেপির নব নির্বাচিত
জাতীয় কার্যকরী সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন মহাশয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দিল পশ্চিম এশিয়ার দেশ ওমান। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন সুলতান হাইথাম বিন তারিক।

ইথিওপিয়ার সংসদের যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য রাখার পর সে দেশের মন্ত্রী
ও সাংসদদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর।

জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর
জর্ডান সফরে পাঁচ সমঝোতা চুক্তিতে সিলমোহর। একজোট হয়ে
সন্ত্রাসদমনে কাজ করার বার্তা দু'দেশের।

বঙ্গ
কমলবার্তা
জানুয়ারি সংখ্যা। ২০২৬

বাস্তুচ্যুত হিন্দু শরণার্থীদের নিয়ে শ্রী অমিত শাহের বক্তৃতার দ্বিতীয় কিস্তি ৪

আসন্ন ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলের বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে দিলেন মোদী-শাহ ৬
অভিরূপ ঘোষ

'ঘরের মেয়ে'-র ফাইল 'চুরি'...থুড়ি ছিনতাই! ১০
জয়ন্ত গুহ

জিহাদি বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার নির্মম ছক ১২
অনিকেত মহাপাত্র

কেন বাংলাদেশে নির্মম এই হিন্দু নির্যাতন? ১৫
রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী

ছবিতে খবর ১৮

লগ্নজিতা আবার গাইবে 'জাগো মা' ২৪
স্বাতী সেনাপতি

বাংলায় ভোটের ভবিষ্যৎ এবং ভূতের ভোট ২৬
পুলক নারায়ণ ধর

পনেরো বছরে তৃণমূলের ব্যার্থতার পাঁচালি ২৯
সোমনাথ গোস্বামী

ধুরন্ধর: যে সিনেমা দর্শকদের বাস্তবতা চিনিয়েছে ৩১
সৌভিক দত্ত

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

ফাইল চালাচালি হয়। ফাইল বেহাত হয়ে যায়। ফাইল গায়েব হয়ে যায়। লাল ফিতের ফাঁসে বন্দী হয় ফাইল। হিমঘরে চলে যায় ফাইল। কিন্তু তা বলে একেবারে ধাঁ করে গিয়ে গোত গোত করে ভিতরে ঢুকে সা করে ফাইল চুরি··· থুড়ি, ছিনতাই করে ভো ভা?

এ কোথায় আছি রে ভাই! কলকাতায় না চাঁদে? অবশ্য চাঁদে এমন ঘটনা কখনও ঘটেছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। জানেন শুধু উনি আর রাকেশ রোশন। হ্যাঁ তো, 'রাকেশ রোশন চাঁদে গিয়েছিল'- উনি বলেছেন।

সময়টা বদলে গেছে হে। দ্রুত বদলে গেছে। বাংলা এখন 'এগিয়ে বাংলা'। যে বাংলায় 'রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন'। মাছে-ভাতে বাঙালীর ঘরের মেয়েকে এখন গভীর রাতে সন্দেশখালির তৃণমূল সম্রাট শাহজাহান তুলে নিয়ে যায়। গোলাপ নয়, পিঠে বানানোর জন্য।

"মুক্তোরামের তক্তারামে শুক্তোরাম খেয়ে বেশ আরামে আছি"-র দিন আর নেই। সবকিছুতেই এখন সন্দেহ হয়। নিজের চোখে যা দেখছি তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে মনে। প্রশ্ন ওঠে নিজের চোখকে নিয়েই।

এই যে ফাইল চুরি···থুড়ি ছিনতাই করে হাওয়া হয়ে গেল, সেটা কি সত্যিই কোনও মানবী ছিল না বাঘিনী ছিল! ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু একটা বাঘ বাঘ গন্ধ আছে। ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে খপ করে শিকার হাতিয়ে নিয়ে পগারপার। হালুম। তবে এই বাঘিনী আসল না চিৎপুরের যাত্রা পার্টির রং করা, তা আমার জানা নেই। যা জানিনা তা নিয়ে কেন ফালতু হ্যাজাবো? এই বাঘিনী কি খায়? কাঁচা মাংস, চকলেট না 'সবুজ ফাইল'? তাও জানিনা। আমি কি রাকেশ রোশন? চাঁদে গিয়েছিলাম? যে সব জানবো?

তবে একটা বিষয় খুব ভাল করে জানি, নির্বাচিত সরকারের আড়ালে প্যাক-প্যাকের যে সমান্তরাল সরকার চলছে এবং তা চালাতে যারা সাহায্য করেছে বা ব্যবহার করেছে তা অসাংবিধানিক-অনৈতিক এবং বেআইনি। শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বাস্তুচ্যুত হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি ঐতিহাসিক অবিচার কংগ্রেসের

সংশোধন করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার

১০ অক্টোবর ২০২৫, নয়াদিল্লিতে 'দৈনিক জাগরণ' আয়োজিত **'নরেন্দ্র মোহন স্মৃতি বক্তৃতা'**-য় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **শ্রী অমিত শাহ** তাঁর শাণিত যুক্তি ও তথ্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে অনুপ্রবেশের ফলে দ্রুত বদলে গেছে জনসংখ্যার মানচিত্র এবং আক্রান্ত হয়েছে দেশের গণতন্ত্র। ভয়াবহ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্যে। এই সংখ্যায় তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার **দ্বিতীয় কিস্তি।**

অমিত শাহ

যখন ভারতীয় জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল এবং শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন আমরা ঐতিহাসিক অবিচার সংশোধন করতে এবং শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান করার জন্য নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন (সিএএ) নিয়ে আসি। এই আইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী এমন একটি কাজ করেছেন, যাকে আমি একটি জাতীয় প্রতিজ্ঞাপালন বলব, এবং এর মাধ্যমে তিনি স্বয়ং জওহরলাল নেহরুর করা একটি প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ করেছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, এই শরণার্থীরা নিজেদের নামে বাড়ি কিনতে পারেনি, সরকারি চাকরি পায়নি, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এমনকি রেশনের সুবিধাও পায়নি। এই আড়াই কোটি বা তিন কোটি মানুষের কি দোষ ছিল? তারা জন্য তো দেশভাগ হয়নি। দেশভাগের সিদ্ধান্ত ভারতের সংসদ নয়, নিয়েছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। শরনার্থী পরিবারের এই মানুষরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নীরবে কষ্ট সহ্য করেছে, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আজ, আমি জিজ্ঞাসা করছি, তারা কি প্রতিটি ভারতীয়ের মতো একই অধিকার পাওয়ার যোগ্য নয়? সাশ্রয়ী মূল্যের খাবার, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা, ভোটাধিকার, সম্পত্তির মালিকানার অধিকার, এগুলো কি তাদেরও অধিকার নয়? যখন সিএএ চালু করা হয়েছিল, তখন সেই আইনকে হেয় করার জন্য রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার চালানো হয়েছিল, এমনকি দাঙ্গাও হয়েছিল। তবুও, এত বিরোধিতা সত্ত্বেও, সিএএ কার্যকর রয়েছে এবং ভারতে প্রতিটি প্রকৃত শরণার্থীর এখন নাগরিকত্বের অধিকার রয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে একজন ব্যক্তি যখন তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে তখন কিভাবে কাজ সম্পন্ন হয়।

শরণার্থীদের নিয়ে ১৯৫১ সাল থেকে যা অস্বীকার করা হয়েছিল এখন সেটা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এখন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করছেন, একজন অনুপ্রবেশকারী এবং একজন শরণার্থীর মধ্যে পার্থক্য কী? আজ আমি এটি স্পষ্ট করতে চাই। যে ব্যক্তি ভারতে তাদের ধর্ম রক্ষা করতে আসে, যারা আমাদের সংবিধানের ১৯ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে তাঁর অধিকার প্রয়োগ করে এবং তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য এখানে আশ্রয় চান, তিনি একজন শরণার্থী।

যারা তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য পালিয়ে এসেছিল তারা কেবল হিন্দুই ছিল না, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টানও ছিল এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে (CAA) এই ধরনের সমস্ত গোষ্ঠীকে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান আছে।

শরণার্থীদের নিয়ে ১৯৫১ সাল থেকে যা অস্বীকার করা হয়েছিল এখন সেটা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এখন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করছেন, একজন অনুপ্রবেশকারী এবং একজন শরণার্থীর মধ্যে পার্থক্য কী? আজ আমি এটি স্পষ্ট করতে চাই। যে ব্যক্তি ভারতে তাদের ধর্ম রক্ষা করতে আসে, যারা আমাদের সংবিধানের ১৯ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে তাঁর অধিকার প্রয়োগ করে এবং তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য এখানে আশ্রয় চান, তিনি একজন শরণার্থী।

যারা তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য পালিয়ে এসেছিল তারা কেবল হিন্দুই ছিল না, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টানও ছিল এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে (CAA) এই ধরনের সমস্ত গোষ্ঠীকে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান আছে।

কিন্তু তারপর একটি প্রশ্ন ওঠে: অনুপ্রবেশকারী কারা? এরা এমন ব্যক্তি যারা ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হননি কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে বা অন্যান্য কারণে অবৈধভাবে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছেন। যদি আমরা এখানে আসতে ইচ্ছুক সকলকে তাদের ইচ্ছামত প্রবেশের অনুমতি দিই, তাহলে আমাদের দেশ কার্যত ধর্মশালায় পরিণত হবে; দেশ এভাবে চলতে পারে না। সকলের প্রবেশের অবাধ অধিকার নেই। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে যারা অবিচারের শিকার

হয়েছেন এবং যাদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের এখানে স্বাগত। এই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি: ভারতের মাটি যতটা অধিকার প্রদান করে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুরাও অধিকার পাওয়ার যোগ্য।

যদি কেউ কেবল অর্থনৈতিক কারণে অথবা ধর্মীয় নির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন অন্য কোনও কারণে আসে, তাহলে ভারত কীভাবে তাদের গ্রহণ করতে পারে? আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং ক্ষণিকের জন্য সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারিনি। একবার হরিয়ানার একজন ১৮ বছর বয়সী যুবক আমার বাড়িতে এসে গেটের বাইরে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সে জিজ্ঞাসা করে কেন আমি সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। আমি তাকে বলেছিলাম যে প্রশ্নটি এতটাই ত্রুটিপূর্ণ যে উত্তরের যোগ্য নয়। যুবকটি বলল, "স্যার, সবাইকে বলুন যে আমরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, আমরা সবাইকে দেশে প্রবেশ করতে দেব।" আমি উত্তর দিলাম, "এটা কীভাবে হতে পারে? আপনি সবাইকে আনতে পারবেন না।" তখন সে খুব সহজভাবে পরামর্শ দিল, "ওদের বলুন, দেশভাগের সময় ওরা যে জমি দখল করেছিল তা ফিরিয়ে দিতে। তারপর আমরা অবশ্যই তাদের স্বাগত জানাবো।" চা-জলখাবার খাইয়ে তাকে আমি বিদায় জানাই। তার সেই পরামর্শ সহজ সরল হলেও কোনও চাতুরি ছিল না। যদিও বাস্তবে তা প্রয়োগ করা যায় না।

অতএব, আমাদের শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীদের একই পৃষ্ঠায় রাখা উচিত নয়। যারা আমাদের সংবিধান বোঝেন, যারা আমাদের ইতিহাস এবং এই জাতির রাজনৈতিক বিবর্তন জানেন, তাদের এই মৌলিক ভুল করা উচিত নয়। আমাদের সংবিধান স্পষ্ট বলা হয়েছে: এই দেশের প্রতিটি ব্যক্তির তাদের ধর্ম অনুসারে তাদের বিশ্বাস এবং উপাসনা করার অধিকার রয়েছে, কেউই সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ যারা এখানে বসবাস করার জন্য আমাদের আইন মেনে চলার পথ বেছে নিয়েছে তাদের কখনও কোনও বিরক্ত করা হয়নি; তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্নও উত্থাপিত হয়নি।

তবে, যদি কেউ কোনও উদ্দেশ্যে ভারতে অনুপ্রবেশ করে, তাহলে তাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং রাষ্ট্র যথাযথ আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, যদি কেউ ভারতে থাকতে চায়, তাহলে কেন আমরা তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করব? আমরা তাদের উপর জোর করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি না। আইনসম্মত পদ্ধতি রয়েছে। পাকিস্তান থেকে যে কোনও ধর্মের যে কেউ আবেদন করতে পারেন, আইনি উপায়ে পাসপোর্ট এবং ভিসা পেতে পারেন এবং এখানে আসতে পারেন; আমরা তাদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করব এবং বিবেচনা করব তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা যায় কি না। সেই পথ খোলা আছে। কিন্তু যদি কেউ অবৈধভাবে প্রবেশ করে, তাহলে সীমান্ত তাদের স্বাগত জানাবে না; অবৈধ অনুপ্রবেশ অবশ্যই আটকানো হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যদি কেউ কোনও উদ্দেশ্যে ভারতে অনুপ্রবেশ করে, তাহলে তাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং রাষ্ট্র যথাযথ আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, যদি কেউ ভারতে থাকতে চায়, তাহলে কেন আমরা তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করব? আমরা তাদের উপর জোর করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি না। আইনসম্মত পদ্ধতি রয়েছে। পাকিস্তান থেকে যে কোনও ধর্মের যে কেউ আবেদন করতে পারেন, আইনি উপায়ে পাসপোর্ট এবং ভিসা পেতে পারেন এবং এখানে আসতে পারেন; আমরা তাদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করব এবং বিবেচনা করব তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা যায় কি না। সেই পথ খোলা আছে। কিন্তু যদি কেউ অবৈধভাবে প্রবেশ করে, তাহলে সীমান্ত তাদের স্বাগত জানাবে না; অবৈধ অনুপ্রবেশ অবশ্যই আটকানো হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বন্ধুরা, কি ঘটেছে কিছু অঞ্চলে শুনুন সেটা। ২০১১ সালে কংগ্রেসের আমলে অসমের আদমশুমারি করা হয়েছিল, আমাদের সরকারের আমলে নয়। ভারতের তথাকথিত উদারপন্থী এবং কংগ্রেস, এর জন্য আমাদের দোষ দিতে পারে না। সেই আদমশুমারিতে, অসমে আমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৬%। কোনও অনুপ্রবেশ ছাড়াই এই সংখ্যাটি অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় এই বৃদ্ধির হার ৪০% ছাড়িয়ে গেছে। যারা অনুপ্রবেশকে একটি মিথ বলে দাবি করেন, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁরা এটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? কিছু সীমান্তবর্তী জেলায়, বৃদ্ধির হার ৭০% ছুঁয়েছে। আমি কেবল রাজ্যের গড় উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে অনুপ্রবেশ সত্যিই ঘটছে। এখনও ঘটছে।

(ভাষণের পরবর্তী অংশ জানতে নজর রাখুন 'বঙ্গ কমলবার্তা'র ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়)।

আসন্ন ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলের

বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে দিলেন মোদী-শাহ

অভিরূপ ঘোষ

"এপ্রিল মাসে বাংলায় ভোট। কুশাসন ভয় অত্যাচারী অনুপ্রবেশকারী সরকারের জায়গায় ভালো সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস এর ১৫ বছরে কুশাসন ও অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বাংলার মানুষ ভয়ে আছে। বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছি মোদীজীর নেতৃত্বে বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি হলে বিকাশের গঙ্গা তেজের সঙ্গে বইবে। ২০২৬-এ বাংলায় বিজেপি দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিতে সরকার গড়বে।"- শ্রী অমিত শাহ।

> **২০২৬ নির্বাচনের দ্বিতীয় ইস্যু দুর্নীতি। সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় শ্রী অমিত শাহ জানান শেষ কয়েক বছরে কয়লা চুরি,গরু চুরি, বালি চুরি, পাথর চুরি, রেশনের চাল চুরি, ১০০ দিনের টাকা চুরি, আবাস যোজনার ঘর চুরি, চাকরি চুরি দেখতে দেখতে রাজ্যবাসী ক্লান্ত। তাঁর মতে দুর্নীতির তালিকা এতটাই বড় যে সেগুলো পড়তে পড়তেই তার সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হয়ে যাবে।**

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আসন্ন। বলা যেতে পারে বাঙালি হিন্দু তথা রাষ্ট্রবাদী যে কোন শক্তির জন্য অস্তিত্ব রক্ষার শেষ লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। ভারত'মা'কে প্রতিনিয়ত অপমান করা তৃণমূল, দেশের 'মাটি'কে বিদেশি মৌলবাদী শক্তির হাতে বিকিয়ে দেওয়া তৃণমূল তথা রাজ্যের 'মানুষ'কে দুর্নীতি, অপশাসন এবং তোষণের এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া তৃণমূলের হাত থেকে মুক্তির শেষ উপায় এই নির্বাচন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই নির্বাচন শুধুমাত্র আর রাজ্যের সীমানায় আবদ্ধ নেই। যেভাবে দিনে দিনে আমাদের রাজ্য দেশবিরোধী মৌলবাদী শক্তির আখড়া হয়ে উঠেছে এবং দুর্নীতি-তোলাবাজি-অপশাসনের চরমসীমায় পৌঁছে যাওয়া একটা দল যেভাবে ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যকে, তাতে রাষ্ট্র ভারতের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব, সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্য আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই এই লড়াই আর শুধু পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেজন্যই তৃণমূলের অপশাসনকে শেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার এই যুদ্ধে গোটা দেশের রাষ্ট্রবাদী মানুষ সামিল হচ্ছেন। শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রী অমিত শাহ, শ্রী জেপি নাড্ডা সহ বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফর সেই লড়াইয়েরই একটা অংশ। ওনারা এলেন এবং তৃণমূলের সমাপ্তি সংগীতের সুর বেঁধে দিয়ে গেলেন।

এই গানের প্রথম ছত্রে থাকছে অনুপ্রবেশ। বিস্তারিত বলার আগে আবারও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-খ্রিস্টান-পারসি কেউ এদেশে অনুপ্রবেশকারী নয়। তারা প্রত্যেকে ভারতের স্বাভাবিক নাগরিক। CAA আইন পাশ করে তাদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিয়েছে মোদি সরকার। এ রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী শুধু এবং শুধুমাত্র মৌলবাদী শক্তি ও তৃণমূল কংগ্রেস পুষ্ট বাংলাদেশী দুধেল গাইয়েরা। এই অপশক্তির গণঅনুপ্রবেশ এ রাজ্যের ডেমোগ্রাফিকে খুব দ্রুত বদলে দিচ্ছে। বাঙালি হিন্দু এবং রাষ্ট্রবাদী শক্তি ধীরে ধীরে সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে এ রাজ্যে। রাজ্য তথা দেশের অখন্ডতা এবং নিরাপত্তার বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের খাতিরে এই মৌলবাদী শক্তির অনুপ্রবেশে ব্যাপক মদত দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস তথা রাজ্য সরকার।

অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্যের অজুহাত বাঁধাধরা। তৃণমূলের মাথা থেকে পা অব্দি সব ধরনের নেতা এবং সাথে বি-সি-ডি টিম (পড়ুন সিপিএম,কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা) এক সুরে অভিযোগ করে যে বিএসএফ

কেন্দ্রের হাতে, সুতরাং অনুপ্রবেশ ঘটে থাকলে তার দায় কেন্দ্রের। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এ রাজ্যে এসে এ প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। তিনি জানাচ্ছেন শেষ কয়েক বছরে রাজ্য সরকারকে বহুবার বলার পরেও ফেনসিং করার জন্য জমি দেয়নি তারা। রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে বহুবার এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হলেও কোনো উত্তর এখনও আসে নি। কেন্দ্র সরকারের তরফে বহুবার বহুরকমভাবে অনুরোধ করা হলেও কোনরকম সহযোগিতা আসেনি। বদলে এসেছে অসহযোগিতা।

এখানে মাথায় রাখা দরকার ভারত যতগুলো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ল্যান্ডবর্ডার শেয়ার করে তারমধ্যে বাংলাদেশই সবার আগে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানা চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। এর মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের সাথে সীমানার দূরত্ব সবথেকে বেশি (২২১৭ কিমি প্রায়) এবং তা নদী-নালা খালবিলে পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় সেখানে কাঁটাতারের ফেন্সিং করা না গেলে শুধুমাত্র নজরদারি দিয়ে এই বিস্তারিত এবং প্রাকৃতিকভাবে শতছিদ্র সীমানাতে কোনভাবেই অনুপ্রবেশ আটকানো সম্ভব নয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু কাঁটাতারের বেড়া এবং বিএসএফ পোস্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি আটকে অনুপ্রবেশকারীদের সহযোগিতা করছে এমনটা নয়। এর সঙ্গে চলছে তাদের অবৈধভাবে এরাজ্যে মদত দেওয়া। একজন অনুপ্রবেশকারী সীমানা পেরিয়ে কোনোভাবে ভারতে ঢুকলে সবার প্রথমে যেতে হবে সীমান্তবর্তী কোনো গ্রামে। গ্রামে একজন অপরিচিত লোক এলো অথচ

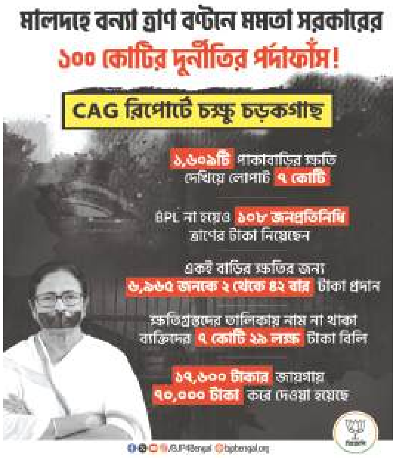

পঞ্চায়েত জানল না,থানা জানল না, জেলা প্রশাসন জানলো না সেটা হতে পারে না। খুব সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে যত জন অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে, প্রত্যেকের কাছে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে করানো রেশন কার্ড,ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড।

ডিসেম্বরে সফরে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তা হল পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম বাংলাদেশের সাথে বর্ডার শেয়ার করে। পাকিস্তানের সাথে আমাদের সীমানা আছে গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব বা জম্মু-কাশ্মীরের। এরমধ্যে কোনো রাজ্য দিয়েই প্রতিবেশী দেশ থেকে অনুপ্রবেশ হয় না এখন। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গ। এখানে শাসকদল নিজের ভোট ব্যাংকের খাতিরে জনবিন্যাস পাল্টাতে একই সাথে অনুপ্রবেশ আটকানোতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধা দিচ্ছে এবং অনুপ্রবেশকারীদের ১০০ শতাংশ সহযোগিতা করছে।

২০২৬ নির্বাচনের দ্বিতীয় ইস্যু দুর্নীতি। সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় শ্রী অমিত শাহ জানান শেষ কয়েক বছরে কয়লা চুরি,গরু চুরি, বালি চুরি, পাথর চুরি, রেশনের চাল চুরি, ১০০ দিনের টাকা চুরি, আবাস যোজনার ঘর চুরি, চাকরি চুরি দেখতে দেখতে রাজ্যবাসী ক্লান্ত। তাঁর মতে দুর্নীতির তালিকা এতটাই বড় যে সেগুলো পড়তে পড়তেই তার সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হয়ে যাবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, এই দুর্নীতির জন্যই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভেন্টিলেশনে চলে গেছে। একটা সময় ছিল যখন ভারতের মোট জিডিপির ১০.৫ শতাংশ আসত এই রাজ্যের থেকে। গোটা দেশে প্রেক্ষিতে তিন নম্বরে ছিল আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। আর আজ বাম তৃণমূলের ৪৯ বছরের শাসনে নামতে নামতে ২২ নম্বরে চলে গেছি আমরা. বাম তৃণমূলের

অপশাসনের আগে আমাদের রাজ্যের নাগরিকদের মাথাপিছু গড় আয় সর্বভারতীয় গড়ের ১২৭% ছিল অর্থাৎ গোটা দেশে একজন যদি একশ টাকা উপার্জন করত তবে এ রাজ্যে একজন ১২৭ টাকা উপার্জন করত সেই সময়. আজ উপরে ওঠার বদলে নামতে নামতে আমরা ৭৩% এ চলে গেছি। একটা সময় যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের জন্য স্বর্ণভূমি ছিল আজ দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং অপশাসনের জন্য তা এক প্রকার মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে. সমস্ত ছোটবড় এবং মাঝারি শিল্প হয় বন্ধ হয়ে গেছে নয় রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

নির্বাচনের এক বড় ইস্যু কেন্দ্রের সাথে অসহযোগিতা। তৃণমূল যতই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার মিথ্যে অভিযোগ তুলুক না কেন এটা সবাই জানে যে শুধু তৃণমূল সরকারের জন্য বাংলার কৃষকরা ১০০০০ কোটি টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ আজও আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পায় না, একশো দিনের কাজে সীমাহীন দুর্নীতি করে এবং তার হিসাব না দিয়ে সেটাও বন্ধ করে দেওয়া চক্রান্ত করছে তৃণমূল। আবহাওয়ার জন্য নদীয়া পৌঁছাতে না পেরে যে অডিও বার্তা সেদিন প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেখানে তিনি এই অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের মোদী বিরোধিতায় তার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শুধুমাত্র মোদির বিরোধিতা করতে গিয়ে রাজ্যের মানুষের যে অপরিসীম ক্ষতি তৃণমূল কংগ্রেস করে চলেছে তা একেবারেই কাঙ্খিত নয়।

নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নারী সুরক্ষা। মাননীয় শ্রী অমিত শাহ যথার্থই বলেছেন যে, যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যের পর মেয়েদেরকে বাইরে বেরোতে মানা করেন আর ধর্ষণের ঘটনাকে তিনি ছোট ঘটনা হিসেবে দেখেন সেখানে নারীরা কোনদিনই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। আর জি কর মেডিকেল কলেজ, সন্দেশখালি, দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজ বা ল-কলেজের ঘটনার উদাহরণ দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান নারীদের সুরক্ষা দেওয়া সরকারের নৈতিক কর্তব্য এবং তাতে এই তৃণমূল সরকার ১০০ শতাংশ ব্যর্থ।

তৃণমূল যদিও চেষ্টা করবে আম জনতার সঙ্গে সম্পর্কিত এই ইস্যুগুলো থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রাদেশিকতার নাটক করতে। কিন্তু তৃণমূল যতই বাঙালি সাজার নাটক করুক না কেন এই রাজ্যের মানুষদের যথাযোগ্য সম্মান একমাত্র বিজেপি সরকারই দিয়েছে। বাংলার মহানভূমির মহান সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম নিয়ে যখন গোটা দেশে উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি তখন নিজের ভোট ব্যাংককে তুষ্ট করতে সবার আগে তাতে বাধা দেয় তৃণমূল কংগ্রেস।

বাঙালি সাজার নাটকের সাথে সাথে এবারে নির্বাচনে একটা অদ্ভুত বিষয় হল তৃণমূলের অবাস্তব সব দাবি, তৃণমূল যতই আড়াইশো সিটের প্রত্যাশা রাখুক না কেন দিনের শেষে এটাই সত্যি যে এপ্রিল মাসে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন হতে চলেছে এ রাজ্যে। মাননীয় শ্রী অমিত শাহ জানান ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, দিল্লি বা বিহারে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে বিজেপি এবং এনডিএ। আর যদি শুধু এ রাজ্যের প্রেক্ষিত বিচার করা যায় তবে ২০১৬ সালের তিনটি বিধানসভা আসন থেকে ২০২১ সালে ৭৭ টি আসনে পৌঁছে গেছে বিজেপি, ২০১৬ সালে যেখানে ১২% ভোট পেয়েছিল বিজেপি সেখানে ২০২১ সালে তা বেড়ে পৌঁছে গেছে প্রায় চল্লিশ শতাংশ, তাই শুধু সময়ের অপেক্ষা কিন্তু এটা নিশ্চিত যে **২০২৬-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন**।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থই বলেছেন গঙ্গা বিহার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। বিহারে জঙ্গল রাজ সাফ করে দিয়েছে মোদী সরকার। এবার পশ্চিমবঙ্গের মহাজঙ্গলরাজ সাফ করার পালা. নববর্ষে বিজেপির নতুন সরকার এক নতুন পথের দিশা দেখিয়ে হৃতগৌরব ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করবে। সেই পথের দিশাই দেখিয়ে গেলেন বিজেপি সর্বভারতীয় নেতৃত্ববৃন্দ।

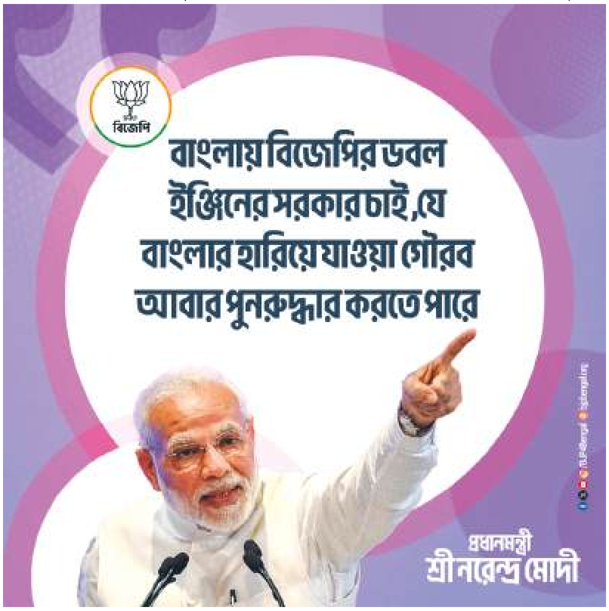

'ঘরের মেয়ে'-র ফাইল 'চুরি'...থুড়ি ছিনতাই!

গৌরব কি বাড়ল বাংলার?

জয়ন্ত গুহ

ব্যক্তি মমতার গুরুত্ব তার পরিবার এবং তার দলে থাকতেই পারে কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী! সংবিধানকে সাক্ষী রেখে শপথ নিয়েছিলেন যিনি, তিনি কি করে একই দেশের একটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে বাঁধা দেন? তিনি কি দেশের বাইরে কোনও সরকার চালাচ্ছেন? পশ্চিমবঙ্গ কি দেশের বাইরে কোনও রাজ্য?

কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ভুলে যান তৃণমূল নেত্রী- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী- মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কথা এবং সেদিন তিনি কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত চলাকালীন যেভাবে তদন্তকারী সংস্থার বাজেয়াপ্ত করা ফাইল তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভুলে যান পশ্চিমবঙ্গের কথা। ভুলে যান মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সেদিন পুলিশ কি করেছিল। শুধু একবার ভাল করে ভেবে দেখুন, এই ঘটনা ভারতের যে কোনও রাজ্যে ঘটলে আপনি কি বলতেন? ভেবে দেখুন সাধারণ মানুষের করের পয়সায় চলা যে কোনও রাজ্যের পুলিশ এই কাণ্ড ঘটালে আপনি কি বলতেন? স্বাধীন ভারতবর্ষের একজন নাগরিক হিসাবে আপনার লজ্জা বোধ হত কি হত না? যে কোনও যুক্তিতে আপনি কি সমর্থন করতে পারতেন এই নৈরাজ্যের উদাহরণ? সেদিন যা ঘটেছে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত চলাকালীন, তাতে কি গৌরব বাড়ল বাংলার। এই বাংলাকে 'এগিয়ে' রাখি কি করে বলুন তো? সত্যি কি পশ্চিমবঙ্গের একজন ভারতীয় বাঙালী এই বাংলা-ই চায়? চায় কি এমনতরো' ঘরের মেয়ে'?

এমন লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত কি প্রথমবার স্থাপন করলেন মমতা? না। আগেও করেছেন। গোটা দেশ জানে সে কথা। ২০১৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এই কলকাতাতেই তৎকালীন সিপি বা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের সরকারি বাসভবনে হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তাদের বাধা দেয় কলকাতা পুলিশ। সে বারেও দ্রুত সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। এরপর মমতা সিপিকে নিয়ে চলে আসেন ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে। সিপি-র বাসভবনে কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযানকে

রাজ্য পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকারের 'চক্রান্ত' বলে দাবি করেন মমতা। প্রতিবাদে সেই রাত থেকেই ধর্মতলায় ধর্না শুরু করেছিলেন তিনি। সেই ঘটনার কয়েক মাস পরে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে রাজ্যে ধাক্কা খায় তৃণমূল। ৪২টির মধ্যে ১৮টি আসন ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপি।

কিন্তু এবারে কি সত্যিই বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন মমতা? নাকি বয়সজনিত কারণে তিনি আবেগ সামলাতে পারেননি? প্রতীক জৈনের মত একজন ভাড়াটে ভোটকুশলী কি এমন জানে যে তাঁকে আগলাতে একটি নির্বাচিত সরকারের প্রধানকে ছুটে যেতে হয়? সাধারণ মানুষের করের পয়সায় যে সরকার চলে সেই সরকারের প্রধান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, চিফ সেক্রেটারি এবং পুলিশ প্রধান-রা সবাই ছুটে যাচ্ছে একটি বেসরকারী সংস্থার প্রধানকে বাঁচাতে? কেন? মুখ্যমন্ত্রী কে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে? সরকারটা চালাচ্ছে কে? প্রতীক একজন পেশাদার মাত্র। পড়াশুনায় ভাল ছাত্র ছিল। কিন্তু সে বা তার সংস্থা তো সরকার নয়। তিনি তো কোনও নির্বাচিত বিধায়ক বা সাংসদ নন। সরকারি আধিকারিকও নন। এমনকি কোনও কাউন্সিলারও নন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে একজন 'বহিরাগত' মাত্র। তাহলে তাঁকে বাঁচাতে একটা গোটা সরকার ছুটে গেল কেন? নিশ্চয়ই হরিদাসের বুলবুলভাজা বা চপমুড়ি খাওয়ার জন্য নয়! আর শুধু যে গেল তা নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কথায়, 'সাংবিধানিক পদের অপব্যবহার করে তল্লাশির মধ্যেই নথি ছিনতাই' করল? গোটা দেশ জানল সে কথা। মুখ পুড়ল বাংলা-বাঙালীর। কিন্তু তারপর আরও দীর্ঘায়িত হল লজ্জার অধ্যায়! দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল তৃণমূলের ৮ সাংসদ! এরা কারা? আসে কোথা থাকে? এদের কাণ্ডকারখানা দেখলে তো কাজিরাঙ্গার দুষ্টু গন্ডারের চিবুকও রাঙা হয়ে উঠবে। এটা কি সার্কাস? চিৎপুরের যাত্রাপালা? এইজন্য কি মানুষ এদের নির্বাচিত করেছিল?

কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে মমতার মতবিরোধ থাকতেই পারে। বিজেপির সঙ্গে চুলোচুলি হতে পারে। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকার তো কোনও একটি দলের বা পরিবারের নয়! সেটা তো সবার সরকার! ব্যক্তি মমতার গুরুত্ব তার পরিবার এবং তার দলে থাকতেই পারে কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী! সংবিধানকে সাক্ষী রেখে শপথ নিয়েছিলেন যিনি, তিনি কি করে একই দেশের একটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার

তদন্তে বাঁধা দেন? তিনি কি দেশের বাইরে কোনও সরকার চালাচ্ছেন? পশ্চিমবঙ্গ কি দেশের বাইরে কোনও রাজ্য?

এ কোথায় আছি আমরা? এ রাজ্য কি ভারতের মধ্যে নাকি বাংলাদেশের জিহাদিরা আড়াল থেকে দখল নিতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গের? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর হামলা, কুচবিহারে বিরোধী দলনেতা ও প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিককে গাড়িতে পেট্রোল ছিটিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, চন্দ্রকোনায় পুলিশের উপস্থিতিতে বিরোধী দলনেতাকে প্রাণনাশের চেষ্টা, ১০৪ বার বিরোধী দলনেতাকে ছুটতে হয়েছে আদালতে দলীয় মিটিং-মিছিলের অনুমতি নিতে- আরে ভাই এটা কি মগের মুলুক নাকি? এটা কি নৈরাজ্যের বাংলাদেশ নাকি? এটা কি পশ্চিম বাংলাদেশ? নাকি তুরস্ক? একজন মুখ্যমন্ত্রী দিনরাত দেশের ইলেকশন কমিশন আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গালি দিচ্ছে, হাসছে, কাঁদছে, ভ্যাঙ্গাচ্ছে- মাথার গোলমাল নাকি বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ?

আসলে ভয় পেয়েছে মমতা। বেদম ভয় পেয়েছে। তিনি চাইছেন 'ফাটাফাটি খেলতে'। কিন্তু বল আর ওনার পায়ে নেই। ধরতে পারছেন না খেলা। কোন দিক থেকে কোন কেঁচো বেরোবে উনি বুঝতে পারছেন না। ভোকাল টনিকে ভেবেছিলেন ম্যানেজ করে নেবেন কিন্তু কেউ ওনাকে সেই আগের মত গুরুত্ব দিচ্ছে না। ভয় পাচ্ছে না। উনি হালুম হুলুম করে ভয় দেখতে চাইছেন। বাঘিনী হয়ে উঠতে চাইছেন কিন্তু নিশ্চিত বুঝতে পারছেন যে ওনার সময় শেষ। চেঁচিয়ে, ককিয়ে উনি যত 'ভয়ঙ্কর' হয়ে উঠতে চাইছেন ততই বেরিয়ে আসছে হেরে যাওয়ার নিদারুণ আর্তনাদ। উনি জানেন, উনি হেরে গেছেন। হারতে চলেছেন। নিশ্চিত হারবেন। সময় যত যাবে ওনার আক্রমণ আরও কদর্য হবে। সময় শেষ হয়ে গেলে এটাই অনিবার্য।

জিহাদি বাংলাদেশে
হিন্দু হত্যার নির্মম ছক

অনিকেত মহাপাত্র

পুড়ছে হিন্দু বাংলাদেশে। মরছে হিন্দু বাংলাদেশে। রোজ মরছে। জ্যান্ত পুড়ে মরছে হিন্দু। ওপারে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে সনাতনীদের সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় রাজপথে নেমেছে বিজেপি। শুধু বিজেপিই নেমেছে রাস্তাজুড়ে। বিজেপিই তো নামবে। বিজেপি ছাড়া হিন্দুদের পাশে আছেটা কে? বাকীরা মুখোশধারী। হিন্দু নয়। হিন্দু সাজতে চায়।

চার বছর আগে এই জানুয়ারি মাসে ডা.তাসনিম জারা একটি ভিডিও বানিয়েছিলেন যার শিরোনাম ছিল 'জাপানিরা যেভাবে শত বছর বাঁচে'। ভালো লেগেছিল অক্সফোর্ডের পড়ুয়া বাংলাদেশের একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট যেভাবে বাংলাদেশী এবং বাঙালিকে সচেতন করার জন্য ভিডিও তৈরি করছেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন বিশেষত বাংলাদেশীদের কীভাবে বাঁচতে হয় ,কীভাবে বাঁচতে হয় শত শত বছর! কে জানত অক্সফোর্ডে পড়া সেই ছাত্রী বিখ্যাত বা কুখ্যাত 'মেটিকুলাস ডিজাইন'-এর অংশ হিসেবে চলে আসবেন বাংলাদেশে জুলাই মাসে। নিয়ে আসবেন অনেক অনেক মৃত্যুর ফাঁদ। হিন্দু হত্যার সেই ফাঁদ তার পরিকল্পনার মতোই নিশ্ছিদ্র! এরপর পৃষ্ঠপোষকদের ইশারায় হঠাৎ হয়ে উঠবেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। এবং ধর্মান্ধ জামাতের 'অ্যাসেট'। পরে নতুন দল যখন গঠিত হল, 'ডিজাইন'-এর অংশ হিসেবে তাতেও তাঁর জায়গা হয়। জাপানিদের শত বছর বাঁচার টেকনিক শেখাতে শেখাতে কীভাবে যেন,অংশগ্রহণ করে ফেলেছেন গণহত্যায়! সেটাই হল বোঝার জায়গা। ডা. জারা আপনার হাতে লেগে আছে দীপু দাসের রক্ত, আপনার বিদেশী রুমালে লেগে আছে তার দগ্ধ মাংসের গন্ধ! বাজারে প্রচলিত বাজারি সংবাদপত্র কিংবা ব্যাপার করা ব্যাপারী আপনাকে শেখানোর চেষ্টা করবে যে আপনি হঠাৎ-ই 'অংশগ্রহণ করে ফেলেছেন' মাত্র।

সচেতনভাবে অবশ্যই নয়। কারণ এঁরাও একইরকম জ্ঞানপাপী! ডিপ স্টেট সারা বিশ্বে যে প্রাণঘাতী নেশার বাণিজ্য করে তার বখরা পৌঁছোয় এদেরও কাছে। ডা. জারা আপনার কোন অমৃত-ভাষণে ও আপনার বস ড. মুহম্মদ ইউনুসের কোন ইশারায় মাস খানেকের মধ্যে এত মানুষকে (হিন্দুকে) হত্যা করতে পারলেন?

তাহলে আপনার ডাক্তারি কিংবা বাঁচার মন্ত্র শোনানো আসলে আল তাকিয়া ঠিক যেমন আপনার বস 'ইউনুছ' দারিদ্র্য বিমোচনের মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে পুরোপুরি কাঙালের দেশে পরিণত করলেন বাংলাদেশকে। আপনি কি সেরকম ডাক্তার যে ডাক্তারদের প্রায় সত্তরের দশক থেকে কাশ্মীরে দেখা যেতে শুরু করে। যাদের কাছে 'ডালি বাট' (কাশ্মিরী হিন্দু)-রা ভয়ে যেত না চিকিৎসার জন্য। কারণ হিন্দু কাশ্মিরীদের বহুক্ষেত্রে বিনা চিকিৎসায় মরার জন্য ফেলে রাখতেন তাঁরা জেহাদের অঙ্গ হিসেবে। যাদের রক্তক্ষরণ হত পথ দুর্ঘটনায় বা কোনও কারণে তাদের জেহাদি-ডাক্তাররা অপেক্ষা করতেন এবং উপভোগ করতেন কাফেরদের তিলে তিলে মরা। কিছুদিন আগে দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণ ও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র কাণ্ডে যেসব ডাক্তারদের দেখা গেল, যাঁদের মধ্যে কাশ্মীরের ডাক্তার ছিলেন, তাঁরা এই মেডিক্যাল-জেহাদের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতার ফসল। [বি.দ্র. পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আআ-(ভুলভাল)ল আআ-(অর্থহীন)মিন মিসনও সেই পথে প্রায় লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। ২০১৬ সালে ও তারপর ধারাবাহিকভাবে মেডিক্যাল জয়েন্টের সেন্টারগুলোতে গট আপ করে উত্তর সরবরাহ ও বিস্তর টোকাটুকি করে অসংখ্য জেহাদি-ডাক্তার তৈরির পথ প্রশস্ত করেছে। ফলে এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের কাশ্মীরে পরিণত হতে বেশি দেরি নেই।]

ডা.জারা আপনি এবং আপনার বস 'ইউনুছ' এর মধ্যে কবে কবে ছিলেন অকুস্থলে? জানাবেন আমাদের!

বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাস-কে পিটিয়ে পুড়িয়ে হত্যা।

২ ডিসেম্বর নরসিংদীতে গুলি করে খুন করা হয় সোনার ব্যবসায়ী প্রণতোষ কর্মকারকে।

২ ডিসেম্বর ফরিদপুরে মাছ ব্যবসায়ী উৎপল সরকার খুন।

৭ ডিসেম্বর রংপুরে খুন মুক্তিযোদ্ধা যোগেশচন্দ্র রায় ও তাঁর স্ত্রী সুবর্ণা রায়।

১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় গলাকাটা দেহ উদ্ধার অটোচালক শান্ত চন্দ্র দাসের।

১৮ ডিসেম্বর জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয় দীপুচন্দ্র দাসকে।

২৪ ডিসেম্বর রাজবাড়িতে দীপু দাসের মত একই কায়দায় খুন হল অমৃত মণ্ডল।

৩ জানুয়ারি শরীয়তপুরের ব্যবসায়ী খোকনচন্দ্র দাস দগ্ধ হয়ে মারা যান।

৫ জানুয়ারি খুন হন রানাকান্তি বৈরাগী ও মণি চক্রবর্তী।

আপনাদের 'ডিজাইন'-এর শুরু থেকে এই হিন্দুহত্যার সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁচেছে বেসরকারি মতে। ওপরে তো শুধু দিন কয়েকের হিসেব। অবশ্য সরকারি ব্যাপার আর কী-ইবা রয়েছে। উড়ে এসে ফাঁকতালে জুড়ে বসাকে কী আর সরকার না সরকারি বলে। আসলে বিদেশি ডিগ্রি দিয়ে জামাতের, আলবদরের জল্লাদের নৃশংসতাকে কী আর ঢাকা যায় ডা. জারা! আপনারা এই দেশেও অর্থাৎ ভারতে এর শেকড় বেশ গভীরে প্রোথিত করে ফেলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতেও জামাত নিখুঁত পরিকল্পনায় কাজ করে চলেছে। গড়ে তুলেছে 'ডেডিকেটেড' বাহিনী। যারা বিভিন্ন বয়সী এবং বিভিন্ন পেশার। নিজেদের সব বৈষয়িক দিককে ত্যাগ করে তারা কখনও কখনও মাস বা এক বছরের জামাতেও চলে আসে, থাকে ঘরবাড়ি ছেড়ে। কখনও কখনও এও দেখা গেছে তারা নিজেদের বিষয়কে দান করছে জামাতের জন্য। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র এর প্রভাব ক্রমবর্ধমান। ডা. জারা এই 'গ্রেটার বাংলাস্তান' গড়ার পরিকল্পনা বোধহয় আপনার বস 'ইউনুছ'- এর 'মেটিকুলাস ডিজাইন'-এর সবুজ ফাইলে রয়েছে। এই বাংলায়ও সেই ফাইল হাত ঘোরাঘুরি করছে। কিছুই বিশ্বাস নেই!

সম্প্রতি আমেরিকা কর্তৃক ভেনিজুয়েলাকে অবরুদ্ধ করা এবং সেখানকার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক ছিনতাই করে আনা থেকে- কিংবা শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং নেপালে ডিপ স্টেট কর্তৃক 'পাকিয়ে তোলা বিপ্লব' দেখে এটাই মনে হয় এই নতুন শতাব্দীতে ছোটো ছোটো দেশগুলির প্রত্যক্ষ সার্বভৌম বিচরণের দিন শেষ। বৃহৎ দেশগুলি নিজেদের নিকটবর্তী ছোটো ছোটো দেশগুলির প্রতিরক্ষা, বিদেশ সম্পর্ক সহ অন্যান্য বিষয় নিজের হাতে তুলে নেবেই। কারণ কখনও আশঙ্কা থাকবে অন্য শক্তির দ্বারা প্রভাব বিস্তারের কখনও বা সত্যিকারে ঘটবে। রাশিয়ার ইউক্রেনকে আক্রমণের কারণও তাই। ভেনিজুয়েলায় আমেরিকার হস্তক্ষেপের কারণও সমগোত্রীয়। তাইওয়ান নিয়ে চিনের ক্ষেত্রেও পুনরাবৃত্ত হবার সম্ভাবনা। বাংলাদেশ এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও একই সম্ভাবনা প্রবল। 'নিউক্লিয়ার-ব্লাফ'-কে ভারত একবার তুড়ি মেরেছে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় , তার পর থেকে বিষয়টি আর ধর্তব্যের নয়।

৩৫ দিনে ১১ জন হিন্দু খুন ইউনুসের বাংলাদেশে।

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত ডোভাল ভারতের যুবশক্তিকে সম্বোধন করতে গিয়ে সম্প্রতি 'ইতিহাসের শিক্ষা এবং ইতিহাসের প্রতিশোধ' এই দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। আমরা তার খোঁজ না রাখতে পারি, 'তার'কাটা নামের একটি রাষ্ট্রবিরোধী সংবাদমাধ্যম কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তাদের লাইনে খবর করেছে। বাংলাদেশের পুরো ইতিহাসকে সামনে রাখলে কী দাঁড়ায় ? ভারতের 'বঙ্গ' প্রদেশের অন্তর্গত। তার ইতিহাস ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত। হোক ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ তাই বলে মাটি ছেড়ে দিতে হবে। খেতে আপনার শুয়োরের পাল এসে পড়েছে। তাতে খেত শুয়োরের হয়ে গেল নাকি! ভারত নিজের 'সিভিলাইজেসেনাল পেরিফেরি'-কে আবার দাবি করুক। বাংলাদেশ? কিসের বাংলাদেশ? মানচিত্র? সেটি কি ধ্রুব কিছু? সেটি হলে মানচিত্র আঁকিয়েরা কী করবে বসে বসে! এবং সেইদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন ভারত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করবে যে তার ব্যাকইয়ার্ডে অন্য কোনও শক্তি যদি আসে তাহলে আর্থিক বা সামরিক কোনও ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব নিতান্তই তার ব্যক্তিগত। ধীরে ধীরে বাংলাদেশ এমন অবস্থায় আসবে যেখানে তার কোনও সেনাবাহিনী থাকবে না। অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখার জন্য থাকবে পুলিশ। তার নিরাপত্তার, বিদেশনীতি প্রণয়ন এবং আর্থিক দায় ভারতের। শুধু তাই নয় ওখানে কোনও ধর্মীয় দল থাকবে না। রাজাকার, আলবদর সহ জামাতিদের 'কালেক্টিভ পানিশমেন্ট' দিয়ে ধর্মান্ধতার মূল উৎপাটন অনিবার্য। তারপরই শুরু হবে 'সিভিলাইজেসেনাল রিপেয়ারিং' । বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের আত্মজনেরা আমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। তাঁরা আবার ফেরত আসবে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তারই অনুবর্তন হবে। তবে পাকিস্তানের ওপর প্রথমে আঘাত পড়বে জোরালো। তারপর তার রিপেয়ারিং। কারণ তা আরও ছড়ানো ঘা। আর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানকে নিয়ে যে নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছেন, ঘরে বাইরে তার দাম তাকে দিতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে আসিম মুনিরের সেই লাঞ্চের দাম সম্ভবত পাকিস্তানের কয়েক খণ্ডে ভাঙ্গন। ট্রাম্পের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্য রয়েছে। সেগুলি রিয়েল এস্টেট মালিকের কায়দায় লাভ-লোকসান মিটিয়ে নিয়ে সেই যে 'ট্রাম্প টাওয়ার' থেকে বেরিয়ে যাবেন, এরপর ফিরেও তাকাবেন না। মুনিরকে তখন সম্ভবত দেশ ছেড়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিতে হবে (তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের ইতিমধ্যে আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন)। সেখানেও কি শান্তি

বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে বিরোধী দলনেতা।

আছে ! 'আননোন গানম্যান' কোথায় কী বেশে এসে পড়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই!

ভারতের কিন্তু সীমানা বদল হবার পুরোমাত্রায় সম্ভাবনা। নাহলে প্রত্যেকদিন আমাদের গাওয়া 'পঞ্জাব সিন্ধু......বঙ্গ' তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কবিগুরু তো পাঞ্জাব আর বঙ্গের আধাআধির কথা বলেন নি। আলঙ্কারিক অর্থে 'সিন্ধু' শব্দের ব্যবহার করেন নি। কেউ যদি রবীন্দ্রনাথকে সত্যিকারের অধ্যয়ন করেন তবে তিনি কীভাবে পোকায় কাটা ম্যাপটাকে মেনে নেবেন ? আর বাঙালি হিসেবে যদি প্রাণের ঠাকুর রবি ঠাকুরকে ভালোবাসেন তবে দ্বিধা কেন? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে যে রাডক্লিফ সাহেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে! কবে এত বাধ্য ছিলেন আপনি? বাড়ি, স্কুল, কলেজে যে এত ঝুড়ি ঝুড়ি কমপ্লেন আসে সেগুলো কী! আদালত অবমাননার এত অভিযোগ!

প্রগতিশীল অন্ধকারের জীবেদের এড়িয়ে চলুন। বিদেশনীতিতে একটি কথাই চির সত্য 'মাইট ইজ রাইট'। ট্রাম্প খান চমকে ধমকে এবং নাটকীয়ভাবে, অন্যেরা কেউ কেউ ঠাণ্ডা করে রয়ে সয়ে; এই যা পার্থক্য।

এনালেপ্সিস এবং প্রলেপ্সিস-এর পদ্ধতির সাহায্যে বিদেশনীতির একটি রম্য রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হলেও কয়েকটি উপযোগধর্মী পর্যবেক্ষণ অবশ্যই লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজন। তারেক রহমান-এর ট্র্যাক রেকর্ড কিন্তু আমাদের জন্য উপযোগী নয়। শেখ হাসিনার অন্য যা-ই থাক ভারতের প্রতি ব্যক্তিগতস্তরে কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। যা জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরীর মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ফলে পড়ে থাকবে নির্ভেজাল উপযোগ। কে কতটা লেভারেজ নিতে পারবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে এই মুহূর্তে এটাই সম্ভাবনাময়। কারণ কূটনীতিতে কেউ চিরস্থায়ী শত্রু বা মিত্র নয়। সময়-ই বলবান। তবে জামাতের ব্যাপারে ভারত (বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তো সম্ভাব্য অঙ্গরাজ্য) জুড়ে উৎপাটনের একটি রূপরেখা নির্মাণ করা প্রয়োজন। আর হিন্দু হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

একটি দেশের বৈধতা কখন সমাপ্ত হয়? যখন বন্ধু বা বন্ধু-প্রতিম রাষ্ট্রও অনাস্থা ব্যক্ত করে। কেউ এই কথা বলবে না যে নেপাল বাংলাদেশের শত্রু রাষ্ট্র। সেই দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি জানিয়েছেন 'নেপালকে বাংলাদেশ হতে দেব না'। এর চেয়ে তীব্র আঘাত বোধহয় ব্রহ্মাস্ত্রও দিতে অক্ষম। এক লাইনে থাকা পাঁচটি শব্দে শ্রীমতি কারকি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ, ব্যক্তি হিসেবে মুহাম্মদ ইউনুস এবং যে গুণে তিনি এই প্রধান উপদেষ্টা পদে আসীন সেই 'নোবেল' ধাপ্পার জামানত বাজেয়াপ্ত করলেন।

কেন বাংলাদেশে নির্মম এই হিন্দু নির্যাতন?

রাজাগোপাল ধর চক্রবর্ত্তী

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা বারবার নৃশংসতা এবং বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে নতুন রাজনৈতিক উত্থানের পরে সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নৃশংসতার মধ্যে রয়েছে হত্যা, যৌন সহিংসতা, সরকারী কর্মচারীদের জোরপূর্বক পদত্যাগ, অগ্নিসংযোগ এবং বাড়ি, ব্যবসা এবং ধর্মীয় স্থানগুলি ভাঙচুর। অসংখ্য মন্দির ও দুর্গাপূজা মণ্ডপ ভাঙচুর বা আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্মনিন্দা বা ব্লাসফেমির অভিযোগে দীপু চন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু যুবককে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অমৃত মণ্ডল নামে আর এক হিন্দু যুবককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, তোলাবাজির কল্পিত অভিযোগে। সংখ্যালঘুদের প্রায়শই জমি দখল হচ্ছে। চৌঠা আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের তিরিশে জুন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার ২,৪৪২টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরপরই মাত্র ষোল দিনেই (৪-২০ আগস্ট, ২০২৪) ২,০১০ টিরও বেশি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। ২০২৫-এর প্রথমার্ধে, অতিরিক্ত ২৫৮টি আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ২০টি যৌন নিপীড়নের ঘটনা এবং উপাসনালয়ের ওপর ৫৯টি হামলা হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য কাউন্সিল এই তথ্য জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৫-এ জারি করা বিবৃতিতে জানিয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে 'অবিরাম শত্রুতা' চলছে। সংখ্যালঘুদের হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং জমি দখল সংক্রান্ত ২,৯০০ টিরও বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ

রাজনৈতিক কর্মী শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পরে সহিংসতার তরঙ্গে বাংলা সংস্কৃতির পীঠস্থান ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলে। ভাঙচুরের ফলে শ্রেণিকক্ষ, অডিটোরিয়ামের সম্পত্তি এবং বিরল বাদ্যযন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানি সামরিক সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন নিষিদ্ধ করলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত হয়। সুফিয়া কামাল সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ফরিদা হাসান প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সদ্য প্রয়াত প্রসিদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষক ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক সানজিদা খাতুন ছিলেন দীর্ঘদিনের সভাপতি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়, ছায়ানট সদস্যরা স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং শরণার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে কলকাতায় মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা গঠন করেছিলেন। ১৯৯৯ সালে সরকার ধানমন্ডিতে ছায়ানটকে জমি বরাদ্দ করে, ২০০১ সালে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অনুদানে ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন নির্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি ঐতিহ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কারণে মৌলবাদীরা ছায়ানটকে "ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবর্তক", "ভারতীয় এজেন্ট" এবং ভারতীয় "সাংস্কৃতিক আধিপত্য" হিসাবেই দেখে এসেছে। আসন্ন ফেব্রুয়ারীর জাতীয় নির্বাচনকে বানচাল করাও আক্রমণের লক্ষ্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে। একই কারণে বাংলাদেশের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক সংগঠন উদিচি শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিপ্লবী ঔপন্যাসিক সত্যেন সেন এবং রণেশ দাশগুপ্ত দ্বারা ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, শিল্পকলার মাধ্যমে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার জন্য নিবেদিত। বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় সাড়ে চারশোটি কেন্দ্র এবং বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক শাখা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর, ধানমন্ডি ৩২ এর অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ, একশর বেশি সুফি মাজার এবং দরগাহতে ভাঙচুর, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ হয়েছে। ২৬শে ডিসেম্বর আধুনিক বাংলাদেশের রক আইকন, নগর বাউল জেমসের একটি কনসার্ট ফরিদপুরে সহিংস জনতার হামলায় বাতিল হয়।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু কারা?

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা জনসংখ্যার প্রায় ৯%, বেশ কয়েকটি ধর্মীয়, জাতিগত এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। হিন্দু বৃহত্তম সংখ্যালঘু। ২০২২ সালের আদমশুমারি এবং ২০২৫ সালের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে কোনও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা নেই। তবে গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঠাকুরগাঁও ও খুলনা এই চার জেলায় হিন্দুরা জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশের সামান্য উপরে। দিনাজপুর, নড়াইল, পঞ্চগড়, মাগুরা, নীলফামারি, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বেকারের টুপি, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ এই তেরটি জেলায় হিঁদুরা জনসংখ্যার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। তারপর আসে বৌদ্ধরা। জনসংখ্যায় প্রায় দশ লক্ষ। তাদের বেশির ভাগ মানুষ চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে (সিএইচটি) বসবাস করে। পাঁচ লাখের খ্রিস্টানরা বাঙালি এবং গারো এবং সাঁওতাল আদিবাসী ধর্মান্তরিত। এক লাখের আহমদিয়া মুসলিমরাও সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘু, প্রায়শই সামাজিক এবং ধর্মীয় নিপীড়নের মুখোমুখি তারা। শিয়া মুসলিম, প্রায় তেইশ হাজারের শিখ এবং এগারো হাজারের বাহাইও সংখ্যালঘু।

বাংলাদেশে হিন্দু

অবিভক্ত ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ১৯০১ সালের জনগণনায় দেখা যায়, আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে মোট ২ কোটি ৯০ লাখ জনসংখ্যার ৩৩ % অর্থাৎ ৯৫ লাখ হিন্দু ছিল। এরপর ভারতের ৩১ লাখ হিন্দু ২০২২ সালেও ১৯৭৪ সালের অনুপাত ১৩.৫% বজায় থাকলে, ২০২২ সালে হিন্দু থাকতো ২ কোটি ২৩ লাখ। এটা পরিষ্কার, ১৯৭৪-২০২২ সালে ৯২ লাখ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত বা ধর্মান্তরিত।

বছর	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু জনসংখ্যা	শতকরা (%)
১৯০১	২,৮৯,২৭,৬২৬	৯৫,৪৬,২৪০	৩৩.০০%
১৯১১	৩,১৫,৫৫,৩৬৩	৯৯,৩৯,৮২৫	৩১.৫০%
১৯২১	৩,৩২,৫৪,৬০৭	১,০১,৭৬,০৩০	৩০.৬০%
১৯৩১	৩,৫৬,০৪,১৮৯	১,০৪,৬৬,৯৮৮	২৯.৪০%
১৯৪১	৪,১৯,৯৯,২২১	১,১৭,৫৯,১৬০	২৮.০০%
১৯৫১	৪,২০,৬২,৪৬২	৯২,৩৯,৬০৩	২২.০৫%
১৯৬১	৫,০৮,০৪,৯১৪	৯৩,৭৯,৬৬৯	১৮.৫০%
১৯৭৪	৭,১৪,৭৮,৫৪৩	৯৬,৭৩,০৪৮	১৩.৫০%
১৯৮১	৮,৭১,২০,৪৮৭	১,০৫,৭০,২৪৫	১২.১৩%
১৯৯১	১০,৬৩,১৫,৫৮৩	১,১১,৭৮,৮৬৬	১০.৫১%
২০০১	১২,৩১,৫১,৮৭	১১,১৮,২২,৫৮১	৯.৬০%
২০১১	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪	১,২৭,৩০,৬৫১	৮.৫৪%
২০২২	১৬,৫১,৫৮,৬১৬	১,৩১,৩১,১০৬	৭.৯৫%

সূত্র: ভারতের আদমশুমারি ১৯০১-১৯৪১, পূর্ব পাকিস্তান ১৯৫১-১৯৬১ সালের আদমশুমারি, বাংলাদেশ সরকারের আদমশুমারি ১৯৭৪-২০২২

সেনশাস হয় ১৯১১, ১৯২১ ,১৯৩১ ও ১৯৪১ সালে, প্রতি দশ বছর হিন্দু জনসংখ্যা কমে এক থেকে দেড় শতাংশ। ১৯০১-১৯৪১ সালের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা কমে মোট ৫% । ১৯৪১ সালেও ৩৩% হিন্দু থাকলে, মোট ৪ কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যায় এক কোটি ৩৯ লক্ষ হিন্দু থাকতো, কিন্তু ছিল ১ কোটি ১৮ লক্ষ, অর্থাৎ একুশ লাখ মানুষ এই চল্লিশ বছরে ধর্মান্তরিত হয়েছেন বা ভারতে এসেছেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৫১ সালের পাকিস্তান জনগণনায় পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে জনসংখ্যা সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ৪ কোটি ২১ লাখ। ১৯৪১ সালে হিন্দু জন সংখ্যা ছিল ২৮ শতাংশ। এই অনুপাত বজায় থাকলে ১৯৫১ সালে মোট জনসংখ্যা চার কোটি কুড়ি লক্ষের ২৮% অর্থাৎ ১ কোটি ১৮ লক্ষ হিন্দু থাকতো, কিন্তু ছিল ৯২ লাখ। অর্থাৎ দেশ বিভাজনে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ বাঙালি হিন্দু শরণার্থী হয়ে ভারতে আসে। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার ২২.৫% ছিল হিন্দু। ১৯৬১ সালের পাকিস্তান সেনশাস বলছে, আগের দশকের তুলনায় হিন্দু জনসংখ্যা পূর্ব পাকিস্থানে ৩.৫৫ % কমেছে। বাংলাদেশের প্রথম জনগননা হয় ১৯৭৪ সালে। হিন্দু জন সংখ্যা পুরো ৫ % কমে হয় ১৩.৫। ১৯৭৪ সালেও যদি হিন্দু জন সংখ্যা ১৯৬১ সালের মতন ১৮.৫% থাকতো, তাহলে এক কোটি ৩২ লাখ হিন্দু থাকতো। কিন্তু ছিল ৯৭ লাখ। অর্থাৎ ৩৫ লাখ হিন্দু বাংলাদেশ্য মুক্তি সংগ্রাম ও বাংলাদেশ সৃষ্টির সঙ্গে ভারতে এসেছেন। এরপর প্রতিটি সেনসাসে আবার সেই এক দেড় শতাংশ হারে কমেছে। সর্বশেষ জনগননা হয়েছিল ২০২২ সালে ,তখন সাড়ে সতেরো কোটি জন সংখ্যার মাত্র ৭.৯৫%, অর্থাৎ ১ কোটি

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার কারণ

বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৭১ সালে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পরে বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনীতির এক সুবিধাবাদী পথ বহন করে চলে। সংবিধান তার ধর্ম নিরপেক্ষতা হারায়, ইসলামপন্থী আখ্যান রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠে। ২০১১ সালের সংবিধান সংশোধনে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনরুদ্ধার করা হলেও, ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে রয়ে গেছে। আগে স্থানীয় আলেমরা, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যায় স্থানীয় বাস্তবতাকে স্বীকার করে ধর্মপ্রচার করতেন। ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের কারণে, বাইরের নেতা বা পণ্ডিতরা স্থানীয় আলেমদের স্থান নিচ্ছেন। তাদের পাঠ্যের ব্যাখ্যায় অনেক সময় স্থানীয় বাস্তবতা উপেক্ষিত হচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের পদ্ধতিগত প্রান্তিককরণ এবং বাংলাদেশে ধর্মীয় চরমপন্থার অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে প্রভাবশালী গবেষক, অধ্যাপক আবুল বারকাত সংখ্যালঘু বঞ্চনার নির্মম কাহিনী তাত্বিক ভাবে তুলে ধরছেন। তাঁর তিনটি গ্রন্থই, বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের বঞ্চনা: নিহিত সম্পত্তির সাথে বসবাস (২০০৮), কৃষি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি: বাংলাদেশে ভূমি- জলাশয় (২০১৬) এবং বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি (২০০৫), বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থানের মূল লক্ষ্য বুঝতে সাহায্য করে। তার সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজটি সম্পত্তি আইন (পূর্বে শত্রু সম্পত্তি আইন) সংক্রান্ত। এই আইন রাষ্ট্র-অনুমোদিত জমি দখলের প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা বলে উল্লেখ করেন তিনি। তার গবেষণা থেকে জানা যায় যে ১৯৬৫ এবং ২০০৬ এর মধ্যে হিন্দু

সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন প্রায় ২৬ লাখ একর জমি দখল বা উচ্ছেদ করা হয়েছিল। বারকাতের গবেষণায় দেখা গেছে যে ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১৩ লাখ হিন্দু ধর্মীয় নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তার গবেষণা থেকে উঠে আসে, বর্তমান অভিবাসনের হার (প্রতিদিন গড়ে ৬৩২ জন)বজায় থাকলে আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে আর কোনও হিন্দু অবশিষ্ট থাকবে না। সত্য বিশ্লেষণের অপরাধে অধ্যাপক বারকাতকে ইউনুস সরকার ১১ই জুলাই ২০২৫ গ্রেপ্তার করে।

ভারতে প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের অবনতিশীল পরিস্থিতিতে ভারতের রাজনীতি ও সমাজ চেতনায় আঘাত হানছে। সম্প্রতি হিন্দু নাগরিক দীপু চন্দ্র দাসের গণপিটুনি ও পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে নয়াদিল্লি ও কলকাতায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। ভারত সরকার কূটনৈতিক সতর্কতা থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও কৌশলগত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করছে। চরম জরুরি চিকিৎসা ব্যতীত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য প্রায় সব ভিসা পরিষেবা স্থগিত করেছে ভারত। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে চাল রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং 'পাওয়ার স্কুইজ' বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে বিদ্যুত কেনে। তাদের উত্পাদন ক্ষমতার ১০% এরও বেশি ভারত থেকে যায়। ঝাড়খণ্ডের আদানি পাওয়ার প্লান্টের পুরো ১,৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুত চলে যায় বাংলাদেশের গ্রিডে। জ্বালানি সরবরাহের সমস্যায় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন যথেষ্ট সংকটে। ভারত থেকে বিদ্যুত না এলে লোড শেডিং এর ধাক্কা সহিতে হবে, বিপর্যস্ত হবে নগর জীবন, শিল্প ব্যবস্থা। ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করেনি। অংশীদার দেশ থেকে অর্থ প্রদান বিলম্বিত হলে আদানি পাওয়ারের মতো বিদ্যুৎ রফতানিকারকদের ভারতে অভ্যন্তরীণভাবে বিদ্যুৎ বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা পরোক্ষ চাপ তো বটেই।

পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির শশী থারুরের নেতৃত্বে "ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যত" শিরোনামে সম্প্রতি এক সংসদীয় প্রতিবেদনে উপস্থাপন করেছে। কমিটি বাংলাদেশে বর্তমান অস্থিরতাকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতের "সবচেয়ে বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ" হিসাবে চিহ্নিত করেছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের পতন এবং বাংলাদেশে চীন ও পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ভারতের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর বলে কমিটি মনে করছে। ভারত বাংলাদেশ সংক্রান্ত নীতির পুনর্মূল্যায়ন না করলে বাংলাদেশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। ইসলামপন্থী বাহিনীর পুনরুত্থান এবং ভারত বিরোধী সব শক্তি একসুরে কথা বলার মনোভাব ভারতের পক্ষে বিরাট অস্থিরতা নিয়ে এসেছে। ভারত বিরোধী মনোভাব পর্যবেক্ষণ ও মোকাবেলায় বিদেশ মন্ত্রকের (এমইএ) বহিরাগত প্রচার বিভাগের আরও সজাগ হওয়া দরকার। বাংলাদেশী নাগরিকদের আস্থা অর্জনে শুধু ক্ষমতাসীন দল নয়। সকল রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা হওয়ার সুপারিশ এসেছে কমিটি তরফে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভারত সরকারকে আরও কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তর করতে হবে। জাতীয়তা যাচাইকরণ পরিচালনা এবং অনথিভুক্ত অভিবাসীদের মানবিক প্রত্যাবাসনে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রস্তাব করেছে কমিটি।

চিকেন নেক-এ সামরিক প্রস্তুতি ভারতের

শিলিগুড়ি করিডোরে ভারত এতোকাল তার সামরিক অবস্থান "স্ট্যাটিক বর্ডার ম্যানেজমেন্ট" করতো। এখন ভারত "ফরোয়ার্ড ডিটারেন্স" বা এগিয়ে থেকে প্রতিরোধের পথে। করিডোরের চারপাশে একটি সুরক্ষা বলয় গঠনে ভারতীয় সেনাবাহিনী ধুবড়ি সীমান্তের কাছে বামুনিতে লাচিত বরফুকন মিলিটারি স্টেশন, বিহারের কিষাণগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের চোপড়ায় শত্রু মোকাবিলার যাবতীয় সামরিক শক্তি নিয়ে নতুন তিন অগ্রবর্তী ঘাঁটি গড়েছে। শিলিগুড়ির কাছে সুকনায় ত্রিশক্তি কর্পস টি- ৯০ ট্যাঙ্কের নিয়ে নিয়মিত যুদ্ধের মহড়া চালাছে। পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারা বিমান ঘাঁটিতে সদা প্রস্তুত রাফাল যুদ্ধবিমান। সেনাবাহিনী এখন রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষের যেকোনো আগ্রাসন রুখতে থুয়াম্পুইয়ের কাছে মিজোরামে চতুর্থ প্রধান ঘাঁটি প্রস্তুতির পথে। "যুদ্ধকালীন তৎপরতায়" সীমান্তে বসছে স্মার্ট বেড়া, নাইট ভিশন, অত্যাধুনিক স্ক্যানার প্রভৃতি। শিলিগুড়ি করিডোর আজ এক সামান্য সীমন্ত থেকে "দুর্গযুক্ত চোকপয়েন্টে" রূপান্তরিত।

বাংলাদেশে এই ভারত বিদ্বেষী সহিংসতার সঙ্গে মালদ্বীপে চিনা মদতে ঘটে যাওয়া 'ইন্ডিয়া আউট' আন্দোলনের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নির্বাচন এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারত "হস্তক্ষেপ" করছে এইরকম আখ্যান খাড়া করে গণ আন্দোলন হয় দুই দেশেই। সুপরিকল্পিতভাবে সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই, ধর্মীয় অনুভূতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী বাগাড়ম্বরকে কাজে লাগিয়ে ভারতকে একটি শত্রু দেশ হিসাবে চিত্রিত করা হয়। মালদ্বীপে, মোহাম্মাদ মুইজ্জুর নির্বাচনের পরে রাষ্ট্র এই আন্দোলনকে মদত দেয়। উপদেষ্টা ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলদেশের আন্দোলনকে জোরদার করে। মুইজ্জুর পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারত বিদ্বেষী মনোভাবে বিরাট ভাবে নির্বাচনে যেতে। ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশে ভারত বিরোধী সরকার গঠনের অনুরূপ প্রত্যাশা করে। যদিও বাংলাদেশে বিএনপি জানিয়েছে তারা জামাতের সঙ্গে নির্বাচনী জোটে নেই। মধ্যপন্থী, উদার ও গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কয়েক দশকের জোট ভেঙেছে বিএনপি। জামায়াত থেকে দূরে সরে গিয়ে বিএনপির লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ ভোটারদের কাছে পৌঁছানো। ইসলামপন্থী পুনর্জাগরণ সম্পর্কে তারা যে সতর্ক এটা বোঝাতেই এই বিচ্ছেদ। বার্তা অবশ্যই ভারতের কাছে। ওরা যদি এনসিপির আহ্বান প্রত্যাখান করে একক ভাবে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং জিতে আসে, বাস্তববাদী পথে যেতে বাধ্য। আর সেই পথেই যেতে হবে বাংলাদেশকে।

ছবিতে খবর

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেন বিজেপি রাজ্য দপ্তরে স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারের।

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কোর-গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

কলকাতায় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

কলকাতা মহানগর কর্মী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জী সহ রাজ্য নেতৃত্ব এবং বিজেপি কর্মীবৃন্দ। এই সম্মেলন থেকেই প্রতিটি বিজেপি কর্মী, অনুপ্রবেশমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার এবং অত্যাচারী মমতা সরকারের অবসান ঘটানোর শপথ গ্রহণ করে।

ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জীর জন্মদিবস উপলক্ষে 'সুশাসন দিবস' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর

উত্তর মালদার চাঁচলে 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ
স্থানীয় সাংসদ-বিধায়ক, অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

কোচবিহারের পুরাতন পোস্ট অফিস মাঠে 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় অভিনেতা শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী সহ
স্থানীয় বিধায়কগণ এবং অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার দাসপুর বিধানসভার কলাইকুন্ডু প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে 'পরিবর্তন সংকল্প'
সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার সহ জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

শিবপুর রামরাজাতলা বাস স্ট্যান্ডে 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য্য সহ রাজ্য-জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে 'মহিলা বিস্তারক প্রশিক্ষণ' কার্যক্রমে শ্রীমতী স্মৃতি ইরানি।

খয়রাশোলে দুবরাজপুর বিধানসভার বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপি নেতা শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ জেলা নেতৃত্ব।

মালবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের ওদলাবাড়ি কালিতারা সিনেমা হল সংলগ্ন মাঠে 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় সাংসদ শ্রী রাজু বিস্তা, ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় ও শ্রী মনোজ টিগ্গা সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

বারাসাতে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় উচ্ছ্বাসের স্রোত।

জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ডাকে ধূপগুড়ি যতীনের হাট মাঠে 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় অভিনেতা শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী সহ বিধায়ক-সাংসদ, জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

কুচবিহারে পঞ্চানন স্মৃতি সদনে রাজবংশী নেতা শ্রী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান এবং কর্মীদের সঙ্গে আন্তরিক আলাপচারিতায় রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

ছবিতে খবর

ভারতীয় জনতা পার্টি হাওড়া সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তাদের সাথে সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক সংগঠন শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী ও জেলা-রাজ্য নেতৃত্ব।

বিজেপি বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার ডাকে 'পরিবর্তন সংকল্প' পদযাত্রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার, বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর।

কলকাতা পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রের বুথ সশক্তিকরণ অভিযান বৈঠকে রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতি ফাল্গুনী পাত্র এবং অন্যান্য সম্মানীয় নেতৃত্ব।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায় বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বনসল মহাশয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর সহ বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

লগ্নজিতা আবার গাইবে 'জাগো মা'

এটা পশ্চিমবঙ্গ, 'তৃণমূলের পশ্চিম বাংলাদেশ' নয়

স্বাতী সেনাপতি

বাংলা ও বাঙালী নিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল মাঝেমাঝেই ডুকরে কুমীরকান্না কাঁদে, তাঁরা কোন গর্তে গিয়ে লুকোয় যখন লগ্নজিতা-মধুবন্তীদের ওপর ইসলামিক মৌলবাদীদের আক্রমণ হয়? কোন বাংলা ও বাঙালী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দরদ উথলে ওঠে? অনুপ্রবেশকারী ভারতবিরোধী বাঙালী নাকি পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় বাঙালীর মুখ্যমন্ত্রী তিনি? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁকেই দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬-এর নির্বাচনে।

ঘটনা ১ - বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান ধানমন্ডির ছায়ানটে আক্রমণ চালালো ইসলামিক মৌলবাদীরা। ভবন ভাঙচুর করা হয় হারমোনিয়াম তবলায় অগ্নিসংযোগ করা হয়, ভেঙে ফেলা হয়। কারণ ইসলামে গান-বাজনা সংগীত হারাম।

ঘটনা ২ - পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে গান গাইতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হলেন কলকাতার সংগীতশিল্পী লগ্নজিতা। একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার ডাক পান শিল্পী। তিনি মঞ্চে 'জাগো মা' গান গাইতে শুরু করলে সেই স্কুলের অন্যতম মালিক মেহেবুব মল্লিক মঞ্চে উঠে তাঁকে মারতে আসে। তাঁকে বলা হয়, "অনেক ধর্মীয় গান গেয়েছিস। এবার সেক্যুলার গান গা। লগ্নজিতা এই ঘটনার প্রাথমিক অভিঘাত কাটিয়ে উঠে যখন ভগবানপুর থানায় এফআইআর করাতে যান সেখানে ওসি শাহজাহান হক তাঁর এফআইআর নিতে চাননি। তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে গোটা বিষয়টা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা হয়।

কি মনে হচ্ছে দুটো ঘটনাই বাংলাদেশের তাই তো? কিন্তু আদতে দুটো দেশ আলাদা, দেশের মানুষজন আলাদা। অথচ সেই এক চেনা ছক ইসলামিক মৌলবাদীদের। যে মৌলবাদীরা বাংলাদেশের সঙ্গে থাবা বসাচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও। মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে দুই বাংলা। তবে সেটা সংস্কৃতির সাঁকো বেয়ে নয়, বরং ইসলামিক মৌলবাদীদের হাত ধরে এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়।

তবে শুধু লগ্নজিতার সঙ্গেই যে এমন ঘটনা ঘটেছে তা নয়। লগ্নজিতার পর লোকসংগীত শিল্পী মধুবন্তী মুখোপাধ্যায়কেও চরম

হেনস্থার মুখে পড়তে হয়, 'তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো' গানটি গাওয়ার জন্য।

২১ ডিসেম্বর তাঁর অনুষ্ঠান ছিল মাজদিয়া কৃষ্ণগঞ্জে, লালন উৎসবে লোকসঙ্গীত গাওয়ার জন্য গায়িকার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। গায়িকা সেখানে গিয়ে একটা গান গেয়েছিলেন, তা হল শাহ আব্দুল করিমের জনপ্রিয় গান 'তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো'। শ্রোতারা এই গানটি মুগ্ধ হয়ে শোনেন। গানটির শেষে হঠাৎ করে এক ভদ্রলোক মঞ্চে উঠে আসেন এবং গায়িকার থেকে মাইক্রোফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে উনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন আমরা এই জাত-পাতের গান শুনব না, আমরা কোনও ধর্মের গান শুনব না। আপনি অন্য গান করুন।

এইখানেই এই গল্পটা শেষ। কিন্তু শেষ কি? এটা কি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা? আসল সমস্যা একজন মেহেবুব মল্লিক নয়। আসল সমস্যা মৌলবাদী ইসলামের মানসিকতা। এই মানসিকতাই মনে করে গান গাওয়া হারাম। আজ লগ্নজিতা "জাগো মা" গাইলে সেকুলার গানের দাবি জানিয়ে ঠ্যাঙাতে আসছে।কাল লগ্নজিতা "সেকুলার গান" গাইলেও ঠ্যাঙাতে আসবে। পরশু লগ্নজিতা গান গাইলেই ঠ্যাঙাতে আসবে। তরশু লগ্নজিতা গান গাইবেন না, তবে তার মুখ দেখা যাচ্ছে বলে ঠ্যাঙাতে আসবে। তারপর দিন লগ্নজিতা চক্রবর্তী বলেই কেউ আর থাকবেন না। তাকে হয় ধর্ম পরিবর্তন করে আরবি নাম নিতে হবে, নয়তো গনিমতের মাল হয়ে যেতে হবে। সেদিন অবশ্য ঠ্যাঙাবার দরকার পড়বে না। সেদিন পৃথিবীর বুকে অখণ্ড শান্তি নেমে আসবে।

আমি শুরু করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গ কেন বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে সেটা দিয়ে। দেখুন ইতিহাস ঘাঁটলে আপনারা দেখতে পাবেন সব ক্ষেত্রেই একটা প্যাটার্ন রয়েছে। ইসলামিক মৌলবাদীরা ধর্মের জিগির তুলে, ধর্ম অবমাননার গুজব তুলে হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করে মন্দির পোড়ায় মূর্তি ভাঙচুর করে এবং সংগীতকে হারাম বলে। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় লালন মেলা বন্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে একই প্যাটার্ন। অথচ সঙ্গীতের কি সত্যিই ধর্ম হয়? বলিউডের একাধিক গানে খুদা, মওলা, রব, আল্লাহ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। গুলজার, এ আর রহমানের মত সুরকার, গীতিকার এঁরা সুফি ধারার বহু গান লিখেছেন। আবার বাংলাতেও রয়েছে আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে বা ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা ইত্যাদি গান। এমন গান তো তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র পুজোর অনুষ্ঠানে গিয়েও গেয়েছেন। কই তখন তো কারও সমস্যা হয়নি। কোনটা সেক্যুলার ? দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে আজান দেওয়া সেক্যুলার? মূর্তি ভাঙচুর সেক্যুলার?

আসলে গোটা দুনিয়ার মানুষ জানে হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের মানুষজন অত্যন্ত সহনশীল। তাই হিন্দু দেব-দেবীদের নামে যা খুশি বলা যায় কালীপুজো উদ্বোধনে হিজাব

পড়ে যাওয়া যায় কিংবা দুর্গা পূজার অনুষ্ঠানে পাল ছেড়ে দে মাঝি যাব মদিনা এই গান গাওয়া যায়। অপরদিকে লগ্নজিতা যখন 'জাগো ভৈরব জাগো মা' গান করেন তখন তাকে হেনস্থা হতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু হয়ে গেছে, সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে সেসব জায়গায় শুরু হয়ে গেছে ফতোয়া। কোথাও আজানের সময় দুর্গা পূজার প্যান্ডেলে গান বাজাতে বারণ করা হচ্ছে তো কোথাও রোজার মাসে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দুদের খাবারের দোকান বন্ধ রাখতে। কোথাও স্কুলে স্কুলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সরস্বতী পূজা, কোথাও আবার স্কুলে বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পরিচায়ক কণ্ঠীর মালা পরলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না স্কুলগুলিতে। কোনটা সেক্যুলার?

প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা। কিন্তু আমরা বিপদ বুঝেও বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারছি না। তাই আমাদের কাছে চিকেন প্যাটিস বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চাপা পড়ে যাচ্ছে মূল সমস্যা- সাইলেন্ট ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ। সংখ্যাতত্ত্বে এগিয়ে যাচ্ছে তথাকথিত সংখ্যালঘুরা। যে কারণে জোর গলায় গান গাওয়ার উপর ফতোয়া দিতে পারছে এত সহজে, আর আমরা শুনতে বাধ্য হচ্ছি! যে কারণে পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে আর আমরা লক্ষ্মী ভাণ্ডার নিতেই ব্যস্ত থাকছি।

বাংলায় ভোটের ভবিষ্যৎ এবং ভূতের ভোট

পুলক নারায়ণ ধর

বাংলায় এখন বুথে বুথে শাসকদলের ভূতলিঙ্গমরা দল বেঁধে 'আমরা চাষ করি আনন্দে' গাইতে গাইতে যে যার ছাপ্পা ভোট দিয়ে আসে। এ অবশ্য নতুন নয়। যেদিন থেকে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেই প্রথম দিন থেকেই ছিল। বলা বাহুল্য এই প্রথার প্রধান কারিগর ছিল কমিউনিস্টরা। এ ব্যাপারে তাদের দক্ষতা ছিল যুগোপযোগী অর্থাৎ যে যুগে যেমন ভেক ধরতে হবে ও কৌশল করতে হবে সেই যুগের সেই রকম কৌশল করেই ভোট দিত ভূত।

একটা কথা এক সময় চালু হয়েছিল সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রিগিং। কথাটা সাংবাদিক মহলে চালু হল। পরে দলগুলিও সবাই এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করছে। সিপিএমের আমলে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সময়ে সিপিএম এই সাইন্টিফিক রিগিং-এর কথা বারবার উল্লেখ করে। এমনকি গবেষক অধ্যাপক রাও নির্বিচারে এই শব্দের মোহে পড়ে আকছার এই শব্দটা ব্যবহার করেন। বিজ্ঞান সত্যকে আবিষ্কার করে। বিজ্ঞান মিথ্যার কুহেলিকা ছিন্ন করে। যা মিথ্যা ও অপরাধমূলক কাজ তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তা কখনোই বৈজ্ঞানিক নয়। যা সত্য নয় তাকে সত্য প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চমকপ্রদ হতে পারে, অদ্ভুত কৌশল হতে পারে, কিন্তু তা কখনো বৈজ্ঞানিক নয়। এই ভুয়া ভোটিং-এর সংখ্যা প্রথম দিকে নগণ্যই ছিল। কিন্তু ভোটারের সংখ্যা ও দলের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। প্রথমদিকে নিরীহ এবং নিরামিষ ভূতুড়ে ভোট। সে সময় রিগিং শব্দটি ছিল না। এক অন্য মাত্রার ফলস ভোট রিগিং। গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে প্রকৃত ভোটারদের ভোট জানে বিরত রাখা। বুথের ভেতরে প্রিজাইডিং অফিসার ও ভোট কর্মীদের ভয় দেখিয়ে ব্যালট বাক্সে ইচ্ছে মতন ছাপ্পা দিয়ে যাওয়া এই প্রক্রিয়ার ফলাফল ভোট প্রক্রিয়ার ফলাফলকে নির্ধারণ করার এই পদ্ধতিরই পোশাকী নাম রিগিং। পাড়ায় পাড়ায় বোমাবাজি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোটারদের বাড়িতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হয়। এই প্রক্রিয়াটা ১৯৭২ সালে বিশেষভাবে শুরু হয়েছিল। এই পদ্ধতির প্রবর্তনের সময় কংগ্রেসের শাসনকাল। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। কলকাতা ও শহরতলীর কোন কোন জায়গায় মানুষ এই ভয়ংকর ছবি দেখেছিল। তার আগে ভোটের রাজনীতিতে নানাভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এসব পথে না গিয়ে সোজাসুজি ডাকাতির পথ বেছে নেয় সেই সময়কার কংগ্রেস দল।

১৯৭২ সালের ভোট কারচুপি আর লুকিয়ে চুরিয়ে করেনি কংগ্রেস দল। প্রকাশ্যে বোমা-বন্দুক ও ভয় দেখিয়ে ভোটারদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যদিও সত্যের খাতিরে বলা দরকার যে এই রিগিং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সর্বাত্মক ছিল না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গঠনের মধ্য দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কারও ছিল না। তবুও কংগ্রেসের গুন্ডারা অতি উৎসাহের বশবর্তী হয়ে কোন কোন জায়গায় এই দুষ্কর্ম করেছিল। পরবর্তীকালে

হিসাব করে দেখা গেছে, এক একটি বুথে এরা সংখ্যায় হয়তো ৩০-৪০ এর বেশি হবে না। গ্রামাঞ্চলে এই গুন্ডামি বা ভোট ডাকাতির ঘটনা বিশেষ ঘটেনি। এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে রিগিং-এর গল্প মেলে না। ১৯৭২ আমি পুরুলিয়া শহরের থেকে একটি দূরবর্তী গ্রামে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল শুধু একটি লাঠিধারী বিহারী পুলিশ কনস্টেবল। সন্ধ্যায় এবং সকালে যে হনুমান চালিশা পাঠ করেই কাটিয়ে দিয়েছিল। কোন উত্তেজনা কোন ভয়ের পরিবেশ ছিল না। ভোট যারা দিতে এসেছিলেন তারা নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়ে গিয়েছেন। কোন দলের কোনও গা জোয়ারি ছিল না কিন্তু কলকাতায় এবং তার আশেপাশে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তার বিবরণ ২-৪ দিন পরেই পেলাম। কলকাতা থেকে আসা আমার পিতৃদেবের কাছ থেকে।

১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে নকশালী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা একপ্রকার সন্ত্রাসের সৃষ্টি করল সারা রাজ্য জুড়ে। বিপ্লবের নামে এই সন্ত্রাস কংগ্রেস সরকার পরবর্তীকালে কঠোরভাবে দমন করেছিল কিন্তু এই সন্ত্রাস কবলিত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত বাঙালি নিজেকে সমস্ত প্রতিবাদ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা বা পথে-ঘাটে গুণ্ডামি দেখলে রুখে দাঁড়ানো- এসব আর মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে দেখা যেত না। এই সুযোগটা কংগ্রেস সরকার চূড়ান্তভাবে তার সুবিধার্থে ব্যবহার করে গিয়েছিল। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন, এর একটি আংশিক উদাহরন। ক্ষমতায় আসীন হয়ে কংগ্রেস সরকার এই সন্ত্রাসকে বিরোধীদের দমন করবার হাতিয়ার হিসেবে আখছাড় ব্যবহার করে গেছে।

নকশালরা এই সময় পুলিশি আক্রমণের মুখে পড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্য বিরোধীদলকে অর্থাৎ সিপিএমকে খতম করার রাজনীতিতে নেমেছিল। এই

সময়ে তাই একটি নতুন শব্দের উদ্ভাবন ঘটল। কংগ্রেস ও নকশাল জোট বন্ধন মিলিয়ে দাঁড়ালো কংশাল নামের একটি শব্দ। সে অন্য গল্প। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে, এর মধ্যে ১৯৭৫ সালের সর্বভারতীয় জাতীয় জরুরী অবস্থার পরিস্থিতিও আছে, একটি অন্ধকার সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় এরপর শুরু হলো অন্য এক ভোট চুরির অধ্যায়।

ভোটের কারচুপি প্রসঙ্গে একটু অতীতে ফেরা যাক। প্রথম নির্বাচন ও পরবর্তীতে কিছুকাল, নির্বাচনে ভোট প্রার্থীদের প্রত্যেকের নামেই পৃথক পৃথক বাক্স থাকতো। ভোটারদের হাতে ব্যালট পেপার প্রদান করা হত। চট দিয়ে ঘেরা একটি জায়গায় গিয়ে ভোটার ব্যালট পেপারে তার পছন্দের চিহ্নে ভোট দিত। এই প্রক্রিয়ায় সুগম হল ভোট বিক্রির পথ। এই প্রথা বন্ধ হল যখন ভোটের বাক্স বুথে প্রিজাইডিং অফিসারের টেবিলেই রাখা থাকতো এবং ভোটদাতা ব্যালট পেপারটি তারই সামনে বাক্সে ফেলতে বাধ্য থাকত। এরপরে এলো খোদ প্রিজাইডিং অফিসারদের ভয় দেখানো। যে দল যেখানে শক্তিশালী (বলা বাহুল্য শাসক দলের শক্তি বেশি) সেই দলের এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাকে ব্যালট পেপারের পেছনে স্বাক্ষর করতে বাধা দিত আর তার স্বাক্ষরহীন ব্যালট পেপার গণনার সময় বাতিল হয়ে যেত। গণনার সময় যদি দেখা যেত (সাধারণত সিপিএম নিয়ন্ত্রিত সরকারি কর্মচারী সমিতির সদস্য) গণনাকারীর পছন্দের দল বা প্রার্থী ভোটটি পায়নি তখন সে তার প্যান্টের নিচে রাখা কালি আঙুলে লাগিয়ে ব্যালট পেপারটির গায়ে গোপনে লাগিয়ে দিত। ব্যলট পেপারটি তখন একটি বহুত্ববাদী সেকুলার চরিত্র লাভ করত। বলা বাহুল্য এই বহুত্ববাদী ব্যালট পেপারটি অনিবার্যভাবে বাতিল হয়ে যেত। এর ফলে গণনায় নিযুক্ত ব্যক্তিটির বিপক্ষ প্রার্থীর একটি ভোট কমত এবং তার দলের প্রার্থীর একটি ভোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেত।

এই পদ্ধতি বা প্রথা চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে অর্থাৎ পেপারের অবৈধ সুবিধা বাম দলগুলি হেসে খেলে সম্পন্ন করেছে। ব্যালট পেপারের পরিবর্তে এরপর এলো ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম। এই পদ্ধতি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হলো কেরল রাজ্যের পরাভূর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৯৮২ সালে ৫০টি বুথে। ১৯৯৮ সালে ইভিএম চালু করা হলো ২৫টি রাজ্যে বিধানসভা কেন্দ্রে, পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালের মে মাসে এই ইভিএম-এ ভোট গ্রহণ করা হয় ২০০৪ সালে ইভিএম ভারতের

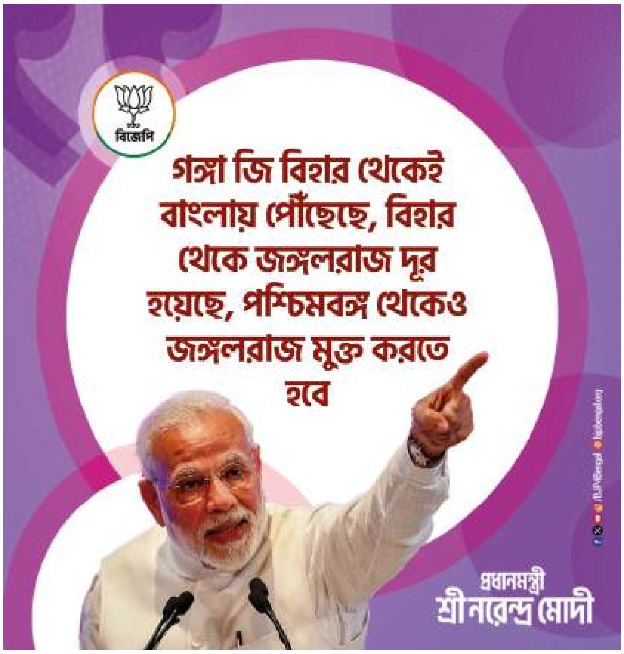

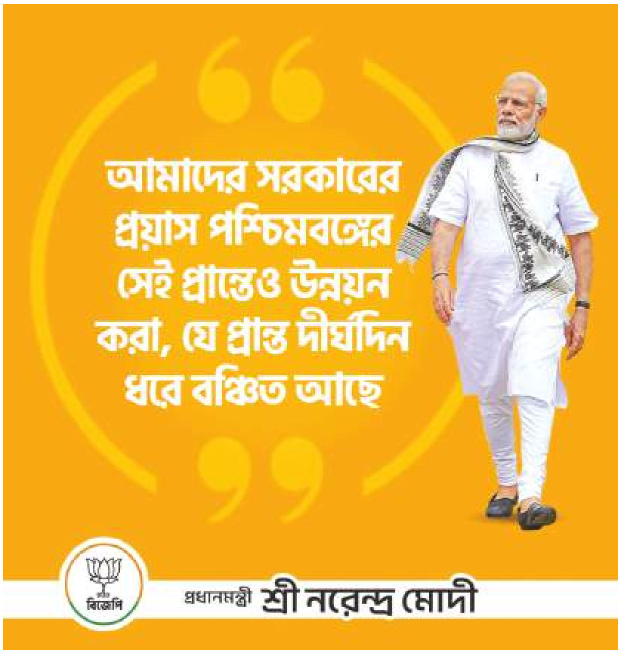

লোকসভার ৫৪৩টি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবর্তিত হল। প্রার্থীদের নাম ও তাদের প্রতীক চিহ্নের পাশে বোতাম নিয়ে বাম দলগুলির পক্ষ থেকে প্রচার শুরু হল ভোটদাতা তার পছন্দের প্রার্থীকে যে ভোট দিলেন তা ঠিক মতন তার প্রার্থী পাচ্ছেন কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। মেশিনে এমন কৃৎকৌশল আছে যার ফলে রামের ভোট শ্যাম ও শ্যামের ভোট রাবন পাচ্ছে না তার নিশ্চয়তা কি? তারা দাবি করতে থাকে ব্যালট পেপারে ভোটই সবচেয়ে বিশুদ্ধ পদ্ধতি। 'কাগুজে' গণতন্ত্রেই তাদের আস্থা বেশি। কাগজের কৌশলেই গণতন্ত্র সবচেয়ে নিরাপদ ও সুনিশ্চিত। তারা নানাভাবে ছদ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে ইভিএম মেশিনে কারচুপি করা সম্ভব কিন্তু তাদের ইভিএম মেশিন বাতিল করার দাবি শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কোথাও তারা ভোটে জিতলে এই ইভিএম মেশিনের দৌলতেই জনগণের জয়,আবার কোথাও ভোটে হারলে, এই মেশিনের জন্যই জনগণের পরাজয় এরকম পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব প্রচার করতে থাকে। এর ফলে ইভিএম মেশিন এর পরিবর্তে এই দলগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা জনগণ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে।

কিন্তু ভোট চুরি করা যার স্বভাব সে জিতলেও করিবে, না জিতলেও করিবে। তাই সর্বদাই তারা নানা প্যাচ পয়জার কলা কৌশল আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকে। কুস্তিতে যেমন শক্তির চেয়ে এই কৌশল ও প্যাচ-পয়জার ব্যবহারেরই জিত হয় তেমনি আমাদের নির্বাচনেও নানা কৌশলের দ্বারাই জয় হয়। তাই পদ্ধতি যতই পাল্টাক না কেন নিত্যনতুন কৌশল ও বাঁকা পথ আবিষ্কার করাই দলগুলির কাজ হয়ে দাঁড়ালো। তার মধ্যে একটি হলো বুথে বুথে অনাকাঙ্ক্ষিত লোককে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে লাইনটা লম্বা করে দেওয়া। এর ফলে প্রকৃত ভোটাররা অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ভোট না দিয়ে বাড়ি চলে যান। আবার বুথের ভেতরে অহেতুক প্রিজাইডিং অফিসারদের সঙ্গে ছোটখাটো ব্যাপারে দলের এজেন্টরা তর্ক জুড়ে দেয়। ফলে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া থমকে থাকে। এরপর গণনার সময়ও প্রার্থীদের এজেন্টদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের ঘরের বাইরে বের করে দেওয়া হয় এবং একচেটিয়া ইচ্ছাকৃত ভুল গণনা করে নিজেদের প্রার্থীদের জয় আদায় করে নেয়।

সেই প্রথম থেকে অর্থাৎ নির্বাচনের প্রথম দিন থেকে যে কারচুপির কৌশল সিপিএম শুরু করেছিল, এবং ক্রমশ যেটাকে একটি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই শিল্পকে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুন্ডাগিরি করেই ভোট জিততে শুরু করল। সেই গুন্ডাগিরির পথই অনুসরণ করতে শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। এরা কোন শিল্প বা সূক্ষ্ম সূচিকর্মে বিশ্বাস করে না এরা বিশ্বাস করে বাহুবলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই প্রক্রিয়া আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। গ্রামে গ্রামে ভোটগ্রহণ এবং সেই বুথেই তার গণনা। এ এক ভয়ংকর খেলা। গণনাকারীদের এবং সরকারি অফিসারদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। তাতে ভয়ে তাদের চেহারা নীল হয়ে যায়।

২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে এসআইআর নিয়ে শাসক দল ও বামপন্থীরা যে আতঙ্কে সৃষ্টি করছে তা আসলে নিজেদেরই পরাজয়ের আশঙ্কায় আতঙ্কের ফল। কিভাবে নতুন কৌশলে এই নির্বাচনে রিগিং করা যায় তা ভেবেই এদের মাথাগরম হয়ে গেছে। যে কোন নির্বাচনে নির্বাচনের প্রাথমিক তো হচ্ছে নির্ভেজাল ভোটার লিস্ট। এই ভোটার লিস্টকে নির্ভেজাল করতে না দেওয়ার অমিত প্রয়াস শাসক দল করে চলেছে। এর পরের প্রক্রিয়ায় কোন কৌশলে কারচুপি করা হবে এই নিয়েই পরবর্তী অধ্যায় এরা আলোচনায় বসবে।

পনেরো বছরে তৃণমূলের ব্যার্থতার পাঁচালি

সোমনাথ গোস্বামী

সুশাসনের বদলে উন্মাদের প্রলাপ। মানুষের ক্ষোভ ঢাকতে প্যাক-প্যাক বিজ্ঞাপন। উন্নয়নের নামে জনগণের পয়সা লুঠের কিসসা ঢাকতে 'ঢপের পাঁচালি'র ডুগডুগি। বাস্তবে তৃণমূলের পনেরো বছরে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প, আর্থিক শৃঙ্খলা, বিনিয়োগ, ব্যাঙ্ক ঋণ, কৃষি ও নতুন যুগের প্রযুক্তি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয় মানচিত্রে নিজের গুরুত্ব হারিয়েছে। এক সময় যে বাংলা ছিল পথপ্রদর্শক, আজ সে নিজেই পথহারা।

এক সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ষাটের দশকে দেশের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ১০.৫ শতাংশ এই রাজ্য একাই বহন করত। শিল্প উৎপাদনে বাংলার অংশ ছিল দেশের মোট উৎপাদনের ২০ শতাংশেরও বেশি। কলকাতা ছিল ব্যাঙ্কিং, বিমা, বন্দর–বাণিজ্য এবং ভারী শিল্পের গর্ভগৃহ।আজ সেই চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। ২০২৩–২৪ সালে রাজ্যের জাতীয় আয়ে অংশীদারি নেমে এসেছে মাত্র ৫.৬ শতাংশে। মাথাপিছু আয়, যা এক সময় জাতীয় গড়ের চেয়ে ২৭ শতাংশ বেশি ছিল, আজ তা জাতীয় গড়ের ১৭ শতাংশেরও নীচে। এই পতন কোনও আকস্মিক নয়, চৌত্রিশ বছরের শিল্প বিরোধী বাম শাসন এবং বিগত পনেরো বছরে তৃণমূল শাসনকালে এই অবনমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। বাংলার অর্থনীতি বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতি আরও দ্রুত বেড়েছে, ফলে বাংলা আজ দেশের মূল স্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে।

তৃণমূল সরকারের আর্থিক কাঠামো গড়ে উঠেছে ঋণনির্ভর ও রাজস্ব ব্যয়কেন্দ্রিক এক বিপজ্জনক নকশার উপর। ২০১১ সালে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০২৩–২৪ সালে ফুলে দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ কোটিরও বেশি। বর্তমানে রাজ্যের মোট ঋণ জিএসডিপি–র ৩৮–৪০ শতাংশ, যেখানে মহারাষ্ট্র প্রায় ১৭–১৮ শতাংশ, গুজরাত ২১–২২ শতাংশ, কর্ণাটক প্রায় ২২ শতাংশে আটকে রেখেছে নিজেদের। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ঘাটতি বহু বছর ধরে জিএসডিপি–র ২ শতাংশের আশেপাশে, আর আর্থিক ঘাটতি গড়ে ৩–৩.৫ শতাংশ। অথচ এই বিপুল ঋণের টাকা ভবিষ্যৎ গড়তে খরচ হচ্ছে না।

মোট ব্যয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ চলে যাচ্ছে বেতন, ভাতা, সুদ ও প্রশাসনিক খাতে, যখন রাস্তা, শিল্পাঞ্চল, বিদ্যুৎ, বন্দর, লজিস্টিক্সের মতো মূলধনী খাতে ব্যয় রাজ্যের আয়ের মাত্র ১.৩–১.৫ শতাংশ। গুজরাত বা তামিলনাড়ুতে এই খরচ ৩–৪ শতাংশ। অর্থাৎ, অন্য রাজ্য যেখানে আগামী দিনের অর্থনীতির ভিত মজবুত করছে, বাংলা সেখানে শুধু আজকের ভার সামলাতে ঋণে ডুবে যাচ্ছে।

তৃণমূল সরকার নিয়মিত দাবি করে যে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর এবং বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বাংলায় বিনিয়োগের সুনামি এনেছে। বাস্তব তথ্য এই দাবি সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলে। ২০১০–১১ সালে যেখানে ভারতের মোট বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল প্রায় ২–৩ শতাংশ, তা ২০১৫–১৬ নাগাদ নেমে আসে ১ শতাংশের নিচে। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই হার কার্যত ০.৫–০.৭ শতাংশে ঘোরাফেরা করেছে। একই সময়ে মহারাষ্ট্র একাই মোট এফডিআই–র ৩০–৩১ শতাংশ, কর্ণাটক ২০–২২ শতাংশ, গুজরাত ১৫–১৭ শতাংশ টেনেছে। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট–এর মঞ্চে ঘোষণা হয়েছে কখনও ২ লক্ষ কোটি, কখনও ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতির কথা, কিন্তু বাস্তবে নতুন বড় শিল্পাঞ্চল, উৎপাদন কেন্দ্র বা বহুজাতিক কারখানা দেখা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্পেন, সিঙ্গাপুর সফরের পরও বাস্তব বিনিয়োগ প্রবাহে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। সম্মেলন হয়েছে, ছবি উঠেছে, হাত মেলানো হয়েছে—কিন্তু কারখানা তৈরি হয় নি।

ব্যাঙ্ক ঋণের পরিসংখ্যান এই ভঙ্গুর বাস্তবতাকে আরও নগ্ন করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলায় আজও ঋণ–আমানত অনুপাত ৪০–৫০ শতাংশে আটকে। রাজ্যের গড় প্রায় ৫২ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় প্রায় ৭০ শতাংশ। এই তারতম্য কোনও ষড়যন্ত্র নয়, এটি ঝুঁকির অঙ্ক। বাংলায় ঋণগ্রহীতা কম কেন? কারণ শিল্পের জন্য উপযুক্ত জমি পাওয়া কঠিন, জমি লেনদেনে দুর্নীতি সর্বব্যাপী, রাজনৈতিক দালালি ছাড়া বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন কঠিন, জমি অধিগ্রহণে অনিশ্চয়তা এবং প্রশাসনিক বিলম্ব যেন

প্রাতিষ্ঠানিক রোগ। "ল্যান্ড ব্যাঙ্ক" কাগজে আছে, বাস্তবে প্রস্তুত শিল্পভূমি নেই। "সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স" স্লোগানে আছে, বাস্তবে দশটি দপ্তরের চক্কর কাটতে হয়। এই পরিবেশে ব্যাঙ্ক বড় ঋণ দিতে চায় না, ফলে শিল্প দাঁড়ায় না, কর্মসংস্থান তৈরি হয় না।

সবচেয়ে বিপজ্জনক অবনমন ঘটেছে নতুন যুগের শিল্প ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। আজ যখন তামিলনাড়ু তথ্যপ্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক যান, প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং জীবপ্রযুক্তিতে বড় বিনিয়োগ নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে; মহারাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যন্ত্রশিক্ষণ ও আর্থিক প্রযুক্তিতে স্টার্টআপ–পরিকাঠামো গড়ছে; উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা কৃষি–প্রযুক্তি ও খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণে শত শত নতুন উদ্যোগকে সরকারি সহায়তায় বড় করছে তখন পশ্চিমবঙ্গ কার্যত দেশের শিল্প মানচিত্রে অনুপস্থিত। রাজ্যে কার্যকর ইনকিউবেশন কেন্দ্রের সংখ্যা নগণ্য, সরকার–সমর্থিত ঝুঁকি তহবিল নেই, বিশ্ববিদ্যালয়–শিল্প সংযোগ দুর্বল। নতুন যুগের শিল্প যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যন্ত্রশিক্ষণ, জীবপ্রযুক্তি, কৃষিপ্রযুক্তি—এসব ক্ষেত্রে বাংলায় বড় কোনও শিল্পাঞ্চল বা নীতি কাঠামো তৈরি হয়নি। ফলে মেধা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, বিনিয়োগ বাইরে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ শিল্পের দৌড়ে বাংলা শুরু থেকেই পিছিয়ে পড়ছে।

এই একই অবস্থা গ্রামবাংলার অর্থনীতিতেও। রাজ্য এখনও অতিরিক্তভাবে নির্ভরশীল ধান–পাট–আলু–কেন্দ্রিক কৃষিতে। যেখানে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক বা হরিয়ানা ফল, সবজি, উদ্যানপালন, ফুলচাষ ও রপ্তানিমুখী কৃষিকে সামনে এনে কৃষকের প্রকৃত আয় বাড়াতে পেরেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ফসল বৈচিত্রিকরণ, কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং বাজার সংযোগ দুর্বলই রয়ে গেছে। কৃষকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার কম, গ্রামীণ ঋণ সমস্যা তীব্র, ফলে লাখ লাখ মানুষ কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে। তৃণমূলের পনেরো বছরে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প, আর্থিক শৃঙ্খলা, বিনিয়োগ, ব্যাঙ্ক ঋণ, কৃষি ও নতুন যুগের প্রযুক্তি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয় মানচিত্রে নিজের গুরুত্ব হারিয়েছে। এক সময় যে বাংলা ছিল পথপ্রদর্শক, আজ সে নিজেই পথহারা।

ধুরন্ধর

যে সিনেমা দর্শকদের বাস্তবতা চিনিয়েছে

সৌভিক দত্ত

ধুরন্ধর আসলে কোনো সাধারণ সিনেমা নয়। এটা একটা মৃত্যুবাণ। যে অশুভ নেক্সাস বলিউড দখল করে রেখে ভারতের তৈরি সিনেমাকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিল, তাদের জন্য মারণবার্তা হল এই সিনেমার সাফল্য। এই সিনেমা এটাই বলছে ভারতের নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক কারণে খুশি রাখতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রশংসা করার কোনও দরকার নেই। বরং স্পষ্টভাবে বলতে হবে পাকিস্তানই আমাদের শত্রু।

দেখে ফেললাম ধুরন্ধর। আদিত্য ধরের লেখা আর পরিচালনায় এই স্পাই মুভি যেন বহু বছরের তৃষ্ণা মেটালো। মাদ্রাস ক্যাফে ধরনের কিছু হাতে গোনা ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভারতে হওয়া স্পাই মুভিগুলো প্রায় সবই জেমস বন্ড সিরিজের অন্ধ অনুসরণ। চোখের আরাম দিলেও মাথার ক্ষিধে মেটাতে পারে না। আর সাথে তো আন্ডারওয়ার্ল্ড এর মাধ্যমে ঢোকা পেট্রোডলার আছেই। যেখানে স্পাই মুভিকে শিখণ্ডী বানিয়ে ভারতের বদনাম করা হয়, ভারত বিরোধী প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়, পাকিস্তানকে মানবিকভাবে দেখানোর চেষ্টা চলে। সব মিলিয়ে দিন দিন স্পাই মুভি বলতেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল পেট্রোডলারে তৈরী পাকিস্থানি প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর রাস্তা। আর সেই একপেশে মৌরিসিপাট্টাতেই আঘাত করেছে ধুরন্ধর!

আর হয়তো সেই কারণেই পাকিস্তান তো অনেক দূরের বিষয়, ভারতের মধ্যে থাকা দেশ বিরোধীরা বা কিছু ইউটিউবার সবাই এত উঠেপড়ে লেগেছিল সিনেমাটিকে ফ্লপ করানোর জন্য। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তির প্রায় এক মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা এবং ভারতের বক্স অফিসে ৯০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। এটা ৯ই জানুয়ারী পর্যন্ত হিসাব। আজকাল না আছে

মাফিয়াদের ব্যাকিং পাওয়া অভিনেতাদের সেই বাজার আর না তাদের পোষা ইউটিউবারদের কেউ পাত্তা দেয়!

দুই পর্বের এই সিনেমাটির প্রথম পর্ব অর্থাৎ ধুরন্ধর শুরু হয় কান্দাহার প্লেন হাইজ্যাকের ঘটনা দিয়ে। যেখানে ভারত সরকার বাধ্য হয় সন্ত্রাসবাদীদের কাছে মাথা নোয়াতে। এরপর আবার আক্রমন ঘটে ভারতীয় সংসদ ভবনে। আর তারপরেই বিদেশমন্ত্রী দেবব্রত কাপুর অনুমোদন করেন আইবি-র পরিচালক অজয় সান্যালের "অপারেশন ধুরন্ধর"। আর সেই মতোই এজেন্ট জস্কিরত সিং রাঙ্গিকে হামজা আলী মাজারি নামে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানে পাঠানো হয়, পাকিস্তানের আন্ডারওয়ার্ল্ডের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের নেটওয়ার্ক দখল করার জন্যে।

তারপরে সিনেমা চলেছে নিজের গতিতে। আশা করি সবাই এতদিনে দেখেই ফেলেছেন ধুরন্ধর। তাই এখানে সিনেমার গল্প লেখা বৃথা। আমি বরং একটু অন্যদিকে যাই, অন্য টপিকে।

আগেই লিখেছি এই সিনেমা নিয়ে পাকিস্তান বাদে সব থেকে বেশি ক্ষেপেছে এই দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি রাজনৈতিক শিবির। আর কেন ক্ষেপেছে, সেই উত্তরেই লুকিয়ে আছে এই সিনেমার মূল ইউএসপি। অন্য অনেক সিনেমার মত ধুরন্ধর কাল্পনিক ঘটনায় ভর করে চলেনি। এটি পুরোপুরি ইতিহাসের টাইমলাইন মেনে চলেছে। আর তার সাথে তুলে ধরেছে কিছু অস্বস্তিকর সত্যিকেও। ভারতেরই তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর হাতে ভারতীয় নোট তৈরির প্লেট পাচার বা উত্তরপ্রদেশে তৎকালীন সরকারের মদতে দেশদ্রোহীদের আখড়া, ২৬/১১ আক্রমণের সময় সাংবাদিকদের অতি সক্রিয়তার ফলে জঙ্গিদের তথ্য পেতে সুবিধা হওয়া - ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয়ই এই সিনেমায় তুলে আনা হয়েছে। আর খুব স্বাভাবিকভাবে তাতে অস্বস্তিতে পড়েছে অনেকে। আর মাধবনের মুখ দিয়ে বলানো একটা ডায়লগ তো রীতিমতো, পড়লো কথা হাটের মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে প্রবাদকেই সত্যি প্রমাণ করে দিয়েছে- "হিন্দুস্তানিদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিন্দুস্তানিরাই, পাকিস্তান তো দ্বিতীয় স্থানে আসে!"

সিনেমা নিয়ে কুৎসা কম হয়নি। আর বিরোধিতার প্রথম অভিযোগই ছিল একটা নাকি প্রোপাগান্ডা সিনেমা। আচ্ছা একবারের জন্য মেনেই নিলাম যে সিনেমাটা প্রোপাগান্ডা। কিন্তু এর আগে বলিউড কেমন সিনেমা বানাতো? দুটো উদাহরণ দিই। হায়দার সিনেমাতে বিসমিল বিসমিল" গানের সাথে শাহিদ কাপুর নাচছেন কোথায়? ম্যুভিতে বলা হচ্ছে ,"শয়তান কা গুফা"। আর সেই শয়তান কা গুফা আসলে কী? কাশ্মীরের বারোশ' বছরের বেশি পুরনো মার্তন্ড সূর্য মন্দির। এইটা প্রোপাগান্ডা নয়? কিংবা চক দে ইন্ডিয়া সিনেমার কথাই যদি ধরি। বাস্তবে যার জীবন কাহিনীর উপর ভিত্তি করেছে সিনেমাটি তৈরি হয়েছিল তার নাম মীর রঞ্জন নেগি, একজন হিন্দু হকি খেলোয়াড়। বলিউড তাকে বানিয়ে দিল কবীর খান, যে নাকি মুসলিম হওয়ার কারণে এবং পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে অপমানের শিকার হয়। কিন্তু সেটাও নাকি প্রোপাগান্ডা নয়। বলিউড এর আগে কোনো প্রোপাগান্ডাই করেনি।

কিন্তু প্রোপাগান্ডা হল একেবারে সঠিক ইতিহাস ও সঠিক টাইমলাইন তুলে ধরা ধুরন্ধর সিনেমাটা। আসলে ভারতের ইতিহাস হিন্দুদের উপরে এত বেশি অত্যাচার আর বিশ্বাসঘাতকতায় ভরা যে, সত্যি ঘটনা তুলে ধরতে গেলেই সেটা হিন্দুত্ববাদী প্রোপাগান্ডা মনে হয়। এখানেও সেটাই ঘটেছে আরকি।

তবে হ্যাঁ সিনেমা সম্পর্কে অপর একটি অভিযোগ অর্থাৎ অতিরিক্ত ভায়োলেন্স এর সাথে আমি কিছুটা একমত। এতটা ভায়োলেন্স সত্যিই অপ্রয়োজনীয় লেগেছে। না দিলেও মূল গল্পের কিছুমাত্র ক্ষতি হতো না। এই অতিরিক্ত হিংসাই হয়তো সিনেমাটার একমাত্র নেগেটিভ দিক হয়ে থাকবে। এছাড়া বাকি সব দিকে সিনেমাটা পারফেক্ট। সাড়ে তিন ঘন্টার সিনেমা, কিন্তু চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে। কাস্টিং অসাধারণ। এমনকি সিনেমার প্রতিটি চরিত্রকে বাস্তবে সেই চরিত্রগুলোর মত প্রায় একই রকম দেখতে বানিয়ে তোলা হয়েছে ঠিক কাস্টিং আর মেকাপের দ্বারা। এই কাস্টিংটাই বোধহয় এই সিনেমার absolute eye-candy! সবাই যথাযথ অভিনয় করেছে। কোথাও কোনো খামতি বা বাড়াবাড়ি নেই। বিশেষত অক্ষয় খান্না আর রণভীর সিং এর কথা তো না বললেই নয়। দুইজনে যেন সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেছে অভিনয় দিয়ে। সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল আর মাধাভান- সবাই পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছে। একই সাথে সিনেমার গান গুলোও বেশ ভালো। পুরনো গানগুলোকে বেশ নতুন ভাবে তুলে আনা হয়েছে। বিশেষভাবে বলতে হয় উস্তাদ ফতেহ আলি খানের সুর থেকে নেওয়া না তো কারওয়ান কী তালাশ হ্যায় গানটার কথা। এই অসাধারণ কাওয়ালি গানটি মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে মারাত্মকভাবে। ২৬/১১ র পর যখন খাননানি ভাইদের অফিসে বসে জঙ্গিদের উল্লাস দেখে সিনেমা হলে দর্শকদের ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল নীলদর্পণ নাটকে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির অভিনয় দেখে বিদ্যাসাগরের জুতো ছুঁড়ে মারা'র গল্প। এতটাই বেশি মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে পেরেছে এই সিনেমা।

ধুরন্ধর আসলে কোনো সাধারণ সিনেমা নয়। এটা একটা মৃত্যুবাণ। যে অশুভ নেক্সাস বলিউড দখল করে রেখে ভারতের তৈরি সিনেমাকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিল, তাদের জন্য মারণবার্তা হল এই সিনেমার সাফল্য। এই সিনেমা এটাই বলছে ভারতের নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক কারণে খুশি রাখতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রশংসা করার কোনও দরকার নেই। বরং স্পষ্টভাবে বলতে হবে পাকিস্তানই আমাদের শত্রু। ধুরন্ধর একটা ব্রেকিং পয়েন্ট। এখন থেকে আর আগের মতো সিনেমা বানানো যাবে না। বানালে মানুষ গ্রহণ করবে না। কারণ এবার দর্শক শুধু তালি দেয়নি- দর্শক বাস্তবতা বুঝেছে। এবং যে সিনেমা দর্শককে বাস্তবতা বোঝায়, সেই সিনেমা সফল বা ব্যর্থ হয় না, সে ইতিহাসের জলবিভাজিকা হয়ে যায়।

বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটি পদাধিকারী

১) সভাপতি- শ্রী শমীক ভট্টাচার্য
২) সহ-সভাপতি- শ্রী সঞ্জয় সিং
৩) সহ-সভাপতি- শ্রী রাজু ব্যানার্জী
৪) সহ-সভাপতি- শ্রীমতী দেবশ্রী চৌধুরী
৫) সহ-সভাপতি- শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল
৬) সহ-সভাপতি- শ্রী দীপক বর্মন
৭) সহ-সভাপতি- শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
৮) সহ-সভাপতি- শ্রী মনোজ টিগ্গা
৯) সহ-সভাপতি- শ্রী নিশীথ প্রামাণিক
১০) সহ-সভাপতি- শ্রী তাপস রায়
১১) সহ-সভাপতি- শ্রী অমিতাভ রায়
১২) সহ-সভাপতি- শ্রীমতী তনুজা চক্রবর্তী
১৩) সহ-সভাপতি- শ্রী প্রবাল রাহা
১৪) সাধারণ সম্পাদক- শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো
১৫) সাধারণ সম্পাদক- শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জি
১৬) সাধারণ সম্পাদক- শ্রী সৌমিত্র খাঁ
১৭) সাধারণ সম্পাদক- শ্রী বাপী গোস্বামী
১৮) সাধারণ সম্পাদক- শ্রীমতী শশী অগ্নিহোত্রী
১৯) সম্পাদক- ডঃ শংকর ঘোষ
২০) সম্পাদক- শ্রী দীপাঞ্জন গুহ
২১) সম্পাদক- শ্রীমতী সোনালি মুর্মু
২২) সম্পাদক- শ্রী মনোজ পান্ডে
২৩) সম্পাদক- শ্রী অম্লান ভাদুড়ী
২৪) সম্পাদক- শ্রী মহাদেব সরকার
২৫) সম্পাদক- শ্রী শাখারভ সরকার
২৬) সম্পাদক- শ্রী সিন্টু সেনাপতি
২৭) সম্পাদক- শ্রীমতী শর্বরী মুখার্জি
২৮) সম্পাদক- শ্রী মোহন শর্মা
২৯) সম্পাদক- শ্রীমতী বিভা মজুমদার
৩০) সম্পাদক- শ্রী সঞ্জয় ভার্মা
৩১) কোষাধক্ষ- শ্রী আশিস বাপট
৩২) যুগ্ম কোষাধক্ষ- শ্রী প্রবীণ আগরওয়াল
৩৩) যুগ্ম কোষাধক্ষ- শ্রী বিদ্যাসাগর মন্ত্রী
৩৪) দপ্তর সম্পাদক- শ্রী প্রণয় রায়
৩৫) যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক- শ্রী প্রত্যুষ মন্ডল

নব নির্বাচিত মোর্চা সভাপতি-বঙ্গ বিজেপি

ক্রমিক সংখ্যা	মোর্চা	সভাপতি
১)	যুব মোর্চা	ড. ইন্দ্রনীল খান
২)	মহিলা মোর্চা	শ্রীমতী ফাল্গুনি পাত্র
৩)	কিষাণ মোর্চা	শ্রী রাজীব ভৌমিক
৪)	ওবিসি মোর্চা	শ্রী শুভেন্দু সরকার (বুলা)
৫)	এসসি মোর্চা	শ্রী সুজিত বিশ্বাস
৬)	এসটি মোর্চা	শ্রী খগেন মুর্মু
৭)	সংখ্যালঘু মোর্চা	শ্রী আলি হুসেন

নব নির্বাচিত সোস্যাল মিডিয়া বিভাগ-বঙ্গ বিজেপি

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	নাম
১)	ইনচার্জ	শ্রী সপ্তর্ষী চৌধুরী
২)	সহ-ইনচার্জ	শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য
৩)	সহ-ইনচার্জ	শ্রী বিজয় ঘোষাল
৪)	সহ-ইনচার্জ	শ্রী উপমন্যু ভট্টাচার্য
৫)	সহ-ইনচার্জ	শ্রী রাকেশ বোস

নব নির্বাচিত আইটি বিভাগ-বঙ্গ বিজেপি

১)	ইনচার্জ	শ্রী জয় মল্লিক
২)	সহ-ইনচার্জ	শ্রী রম্যজ্যোতি সরকার
৩)	সহ-ইনচার্জ	শ্রী রত্নেশ সিং
৪)	সহ-ইনচার্জ	শ্রী শুভজ্যোতি কর্মকার
৫)	সহ-ইনচার্জ	শ্রী সব্যসাচী রায়

নব নির্বাচিত প্রধান মুখপাত্র / মিডিয়া বিভাগ-বঙ্গ বিজেপি

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	নাম
১)	প্রধান মুখপাত্র	শ্রী দেবজিৎ সরকার
২)	মিডিয়া আহ্বায়ক	শ্রী বিমল শংকর নন্দ
৩)	মিডিয়া সহ-আহ্বায়ক	চন্দ্রশেখর বাসুটিয়া

কলকাতায় বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা জী সহ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

২০২৫ সালের শেষ দিনে কলকাতার ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে পূজা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জী।

কল্পতরু উৎসবের পুণ্যদিনে দিল্লির রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন মহাশয়ের।

তামিলনাড়ুর মান্নারপুরমে বিজেপি মহিলা মোর্চা আয়োজিত এক জমকালো পোঙ্গল উৎসবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।